অনিন্দিতা

[অনু-উপন্যাস]

সজল মন্ডল

মান্না পাবলিকেশন

৩০/১ বি কলেজ রো • কলকাতা-৭০০ ০০৯

মামুন
ও
কাজলকে

ঝড় ভেঙে ভেঙে

অনুশ্রুৎ ! অনুশ্রুৎ ! তুমি শুনতে পাচ্ছো ?

বলো।

তুমি ঠিক জানো পৃথিবী শান্ত হবে ?

শান্ত হবে তৃষা। পৃথিবী আবার শান্ত হবে, ঝড় থেমে যাবে যে কোন সময়।

না আর কেউ কথা বলেনি—না অনুশ্রুৎ, না তৃষা।

পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ছে এক একটি ঝড়। পশ্চিম দিক থেকে ভেসে আসা। তৃষা থেকে থেকে মুখ লুকাচ্ছে অনুশ্রুতের বুকে, যার অনুভূতি বলতে ঐটুকুই।

দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর। ঐ চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে প্রথম আড়াই বৎসর ছাড়া এক একটি ঝড় উঠেছে তৃষার জীবনে। তখন তৃষার বয়স কত আর হবে বড়জোর বাইশ অথবা তেইশ। এম. এ. পরীক্ষার আগে তাকে নজরে পড়েছে প্রফেসার অভিষেক চৌধুরীর। সবে দু বৎসর চাকরী পেয়েছেন অভিষেক—বাংলা বিভাগের প্রফেসর।

মেঘনাদবধ কাব্য পড়াচ্ছেন। মন্ত্রমুগ্ধ তৃষা। ক্লাস শেষে বেরিয়ে যাচ্ছেন হল থেকে। তৃষা সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছেন অভিষেক—কি ব্যাপার ? কোন problem...

স্যার আমি একমাস কলেজ আসতে পারব না, যদি Advance Note টা দেন খুব ভাল হয়।

কেন কোথায় যাবে ?

একটু বাইরে যাব।

সে তো বুঝলাম, বাইরেটা কি ভারতের নাকি পশ্চিম বাংলার।

এত কিছু বলতে পারব না, ইচ্ছে হলে দেবেন, না হলে দেবেন না।

দেবনা কখন বললাম। বলছি বাইরে কি এমন কাজ বা কি এমন আত্মীয়তা যে একমাস লেগে যাবে।

সবকিছু সবাইকে বলতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নিশ্চয়ই নেই।

তা নেই ঠিকই। তবে যেহেতু আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোমার বলা উচিৎ ছিল, বেশ বলতে হবে না, Notes গুলো লাইব্রেরীতে রাখা থাকবে, তুমি নিয়ে নিও।

কেন আপনি দিতে পারবেন না ?

তেমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যে অবাধ্য মেয়েকে হাতে তুলে দিয়ে বলতে হবে এই নাও তোমার জন্য special note।

বুঝলাম।

কি বুঝলে ?

আপনার অভিমান হয়ে গেছে। বেশ বলছি। আমি বেনারস যাব মাসীর বাড়ী ওখানে একমাস থাকব, কেন জানেন? মাসী বলেছে ঐ এক মাস এক বিখ্যাত গানের পণ্ডিত ফৈজি যশপালের কাছে classical এর তালিমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উনি বাইরে চলে যাবেন। তার আগে যতটা পারা যায় নিয়ে নিতে।

তুমি গান জানো, জানতাম না তো!

জানবেন কি করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানে কি আপনি থাকেন? কেবল বাড়ী চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত।

ঠিক তা নয়।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, উত্তর দেবেন?

করতে পার, দেওয়ার হলে দেব।

আপনার স্ত্রী খুব সুন্দরী, তাই না?

অবশ্যই, ঠিক তোমার মত।

খুব স্মার্ট, তাই না।

তোমার মত ঝগড়াটে।

কেন আমি কি ঝগরাটে।

ঠিক তা নয়, যুক্তিবাগীশ এবং জেদি।

বাজে কথা বলবেন না বলে দিলাম, বাপিকে গিয়ে সব বলে দেব।

তাহলে তো সুবিধেই হবে।

তার মানে?

আমার ক্লাস আছে, এখন আসছি, notes টা কাল অথবা বুধবার নিয়ে নিও।

দুদিন যেতে না যেতেই অভিষেক মেদিনীপুরে তৃষার বাড়ীতে হাজির। হাতে এক তবড়া notes। যে নোটস্‌গুলো অভিষেককে প্রথমের প্রথম হতে সাহায্য করেছিল। পরিচয় পর্ব শেষ করে একান্তে কথা বলেছিলেন তৃষার মায়ের সাথে, তৃষার মা তৃষার বাবাকে ডেকে সব বলার পর বলেছিলেন, বেনারস থেকে ফেরার পর আলোচনা হবে।

বেনারস থেকে ফিরে এসে তৃষার বাবা অভিষেককে ডেকে পাঠিয়ে মতামত জানিয়েছিলেন। বাকী কাজ সারা হয়েছে দ্রুত। তৃষার সাথে একদিন বিয়ে হয়েছে অভিষেকের।

দুই বৎসর কাটার পর বাচ্চা চেয়েছে অভিষেক, ডাক্তার দেখানো হয়েছে। তারপর তৃষার গর্ভে বাচ্চা এসেছে। আনন্দের শেষ নেই অভিষেকের। এদিকে তৃষা এম এ শেষ করেছে ভাল ফল নিয়ে।

অভিষেক অদ্ভুত, যাকে বলে Top thriller, আবার ভীষণ দুঃসাহসীক বটে। মোটরবাইক

চালাতো সত্তর আশি কিলোমিটার বেগে। সে যখন মোটর সাইকেল চালাতো, মনে হত একটা ঝড় যাচ্ছে রাস্তার বুক চিরে। রাত্রিতে যখন ঝড় উঠত তৃষাকে পাগল করার সে ঝড়ও দুরন্তপনার। কি তৃপ্তি, কি সুখ, সে ঝড়ে তৃষার ইউক্যালিপটাসের মত বেঁকে যাওয়ার আবার সোজা হওয়ার আনন্দ। সেই ঝড়েই হারিয়ে গেল মানুষটা, তৃষা স্বপ্নের ঘরটা যেন চুরমার হয়ে মিশে গেল মাটির সাথে। কাউকে অপরাধী করতে পারেনি তৃষা।

বাচ্চার জন্ম হল তার ঠিক সাত মাস পরে। জানতেই পারল না অভিষেক তার তৃণা পৃথিবীর আলো দেখেছে। শুনতে হল না তার মেয়ের বাবা ডাক।

তৃষা থিতু হচ্ছিল আস্তে আস্তে। তৃণা তখন সবে একবছর। তৃষা চাকরীও একটা পেয়ে গেছে স্কুলে। কিন্তু তৃণা! আবার একটা নতুন ঝড়ের সংকেত। তৃণা হাঁটতে পারছে না, তৃণা কথা বলে না, তৃণা শুনতেও পায় না কেবল দেখতে পায়। ডাক্তার দেখানো চলছে, ডাক্তাররা বলেছেন সম্পূর্ণ বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তৃষাদেবী। আমাদের কিছু করার নেই।

অনুশ্রুৎ বলছে ঝড় থেমে যাবে, অনুশ্রুৎ বলছে পৃথিবী শান্ত হবে। তৃষা তো তাই চেয়েছিল সেই ঝড়টা থেমে যাক। তৃষা চায় আর ঝড় নয় একটি মিষ্টি গন্ধময় বাতাস মনটা জুড়িয়ে দিক, শরীরটা জুড়িয়ে দিক, গভীর ঘুমের মত।

অভিষেক যখন ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জানতে পারল তৃষা মা হতে চলেছে, বাড়ী ফিরে এসে তৃষাকে আদরে ভরিয়ে দিয়েছিল পাগলের মত। তারপর বলেছিল ছেলে হলে নাম দেব অভিযান, মেয়ে হলে তৃণা। তার তৃণা এল, তৃণের মতই। হায় অভিষেক তুমি কি জন্ম দিলে!

দিন দিন চিন্তার গ্রাসে তৃষা হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। স্কুলে যায় class করে, ছুটি হয়, ফিরে আসে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে বাড়ীতে। তার বাড়ী থেকে স্কুলের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার। সকাল নটায় বেরিয়ে যায় কেন না লিমিটেড স্টপ বাসটা ধরতে না পারলে স্কুল পৌঁছাতে বেজে যাবে বারটা। এমন যে কোন কোনদিন হয়নি তা নয়। প্রধান শিক্ষকের দয়ায় উপস্থিতির সইটা করতে পারে তৃষা। অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাই নিয়ে সমালোচনা করে, সে সমালোচনা কানে এসেছে বহুবার কিন্তু কি করবে সে, ঐ বিকলাঙ্গ কন্যা শিশুকে ছেড়ে আসতে মাঝে মাঝেই দেরী হয়ে যায় যে। বাড়ীতে একটা মধ্যবয়সী মেয়ে রেখেছে। সারাদিন দেখভাল করে মেয়েটাকে। খাইয়ে দেয়, স্নান করায়, কোন বিরক্তি নেই মেয়েটার। প্রথম প্রথম বলত—দিদিগো এই মেয়েকে যদি সারাদিন আমাকে দেখতে হয় বেতন লাগবে মাসে পাঁচশ টাকা। এখন আর বলে না, মেয়েটাকে দেখে মায়া পড়ে গেছে বলে।

স্কুলেও ঝড় ওঠে যখন তখন। বিজ্ঞানের শিক্ষক জোতিরাদিত্য রায় বিয়ে করেন নি তখনও। বয়স হয়ে গেছে প্রায় তেত্রিশ। সমানে লেগে আছেন তৃষার পিছনে। এমনিতে

ভদ্রলোক ভীষণ মিসুকে সবারই সাথে সম্পর্ক ভাল। তৃষা দেখেছে, তিনি কোনদিন কারও সাথে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েননি। ক্লাসেও পড়ান ভীষণ ভাল। প্রতিটি ছাত্রছাত্রী তাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে। ভাবাসেন প্রধান শিক্ষক কুমারেশবাবু।

তিনি তো জানেন তৃষাকে, তার অতীতকে, তার ভবিষ্যৎ তৃণাকে। তবুও কেন এভাবে পিছনে লেগে আছেন।

সেদিন স্কুলে রবীন্দ্র জয়ন্তী। ছাত্রছাত্রীরা গান, আবৃত্তি দিয়ে সাজাচ্ছে রবীন্দ্র জয়ন্তী। স্কুলের ছাত্রছাত্রী ছাড়া এসেছেন অভিভাবকরা, গ্রামের অনুরাগী অসংখ্য মানুষ, স্কুলের সেরকমই না কি প্রথা, তৃষাকে একান্তে বলেছিলেন কুমারেশবাবু। অনুষ্ঠান চলছে পুরোদমে। বিজ্ঞানের ছাত্র হলে কি হবে জোতিরাদিত্যবাবু গান জানেন, ভাল আবৃত্তি করেন, আবার সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে নাটকেও অংশগ্রহণ করবেন। এক কথায় চৌখস বলতে যা বোঝায়।

তখন বিকেল চারটা। তৃষা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বলে স্যার আমাকে ছেড়ে দিন। বাচ্চাটা আছে, বুঝতেই তো পারছেন সে বিকলাঙ্গ।

হ্যাঁ মা ছেড়ে দেব। তোমার গাড়ী কটায়?

চারটা কুড়িতে।

আর গাড়ী নেই?

আছে তবে পাঁচটায়।

বেশ বলছ যখন যাও।

তৃষা উঠে পড়েছে বিছানো আসন থেকে, জুতো জোড়াটা পায়ে গলাচ্ছে, এমন সময় পরিচালক জোতিরাদিত্যবাবু মাইকে ঘোষণা করলেন,—আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, শ্রদ্ধেয় অভিভাবকগণ এবং উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলারা, আপনার নিশ্চয় জানেন আমাদের এই ঐতিহ্যময় ঝাঁকরা স্কুলে একজন নতুন শিক্ষিকা গত এক বৎসর এসেছেন। সেই শিক্ষিকা তৃষা চৌধুরী আপনাদের দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনাবেন। একটি বিশেষ অনুরোধ আপনারা দুটি গান ছাড়া অন্য কোন গান গাওয়ার অনুরোধ করবেন না, কেননা ওনার বাস পাঁচটায়, ওটা ধরতে না পারলে ওনার খুব অসুবিধা হবে। তৃষা চৌধুরী দয়া করে আপনি মঞ্চে আসুন।

তৃষা কি করবে ভেবে উঠতে পারছে না, কুমারেশবাবুকে বলে—স্যার দেখলেন কি কান্ডটি বাঁধালেন জোতিরাদিত্য বাবু।

তুমি গান জানো মা?

জানতাম, কিন্তু গত দেড় বৎসর চর্চার মধ্যে নেই।

গুরুর শিক্ষা কি ভুলতে পারা যায়। যাও মঞ্চে যাও।

স্যার ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে জ্যোতিরাদিত্যবাবু আবার ঘোষণা করলেন তৃষাদেবী আসছেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।

ধীর গতিতে মঞ্চে গেছে তৃষা। মাইক্রোফোনটা নিয়ে নেয় জ্যোতিরাদিত্যবাবুর হাত থেকে। তারপর বলে জ্যোতিরাদিত্যবাবু আমাকে এমন বিড়ম্বনায় ফেললেন আমি আপনাদের বোঝাতে পারব না। গান আমি জানতাম, কিন্তু দেড় দুবৎসরের অনভ্যাসে প্রায় সব ভুলতে বসেছি। হয়তো অনেক ভুলক্রটি হবে, আপনারা ক্ষমা করবেন।

জ্যোতিরাদিত্যবাবু মাইক্রোফোনটা তৃষার হাত থেকে নিয়ে ঘোষণা করলেন। তৃষাদেবীকে তবলায় সহযোগীতা করবেন আজকের অনুষ্ঠানের পরিচালক শ্রী জ্যোতিরাদিত্য রায় অর্থাৎ আমি। তৃষা হাসবে না অবাক হবে বুঝতে পারে না। তবলার কাছে জ্যোতিরাদিত্যবাবু বসতেই স্বগতোক্তির মত তৃষা বলে ওঠে—সব্যসাচী তাহলে আমাদের স্কুলেই আছে।

তৃষা প্রথম গান গায় 'আমার সকল দুঃখের প্রদীপ'।

দ্বিতীয় গান 'এই করেছ ভাল নিঠুর হে'।

হাততালিতে ফেটে পড়ছে স্কুলমাঠ।

জ্যোতিরাদিত্যবাবু সঙ্গতটাও করেছেন খুব ভাল। তারপর তৃষা নিজেই ঘোষণা করে আমি ধন্য, আমি অপ্লুত। তার সাথে আপনাদের জানাই তবলচি আমার গানে অদ্ভুত সহযোগীতা করেছেন।

তৃষা চলে গেছে বাড়ী। পরের দিন স্কুল ছুটি। তার পরের দিন রবিবার। সোমবার স্কুল ঢুকেই শুনতে পায় আলোচনার বিষয়বস্তু তৃষা, সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে জ্যোতিরাদিত্য বাবুকে, অবশ্য তার অনুপস্থিতিতে। তৃষাকে দেখে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছে সবাই। তৃষা নিজেই কথা বলে—বলুন আমার গান কেমন লাগল।

সবাই সমস্বরে বলে ওঠে Fantastic। জ্যোতিরাদিত্যবাবু common room এ ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পেয়েছেন সপ্রতিভ প্রশংসা। বলে ওঠেন কেন আমারটার কি খুব খারাপ হয়েছে? কি তৃষা তুমিই বলো—আমার সঙ্গতটা কি খারাপ হয়েছে?

না ভীষণ ভাল হয়েছে।

কুমারেশবাবু বলে ওঠেন—গান শুরুর আগে শুনলাম তৃষা বলছে 'সব্যসাচি, সব্যসাচির কি খারাপ হতে পারে।

সেই থেকে শুরু। তৃষার যে মানুষটাকে ভাল লাগে না তা নয়, কিন্তু সব যে অবাস্তব।

কথাটা জ্যোতিরাদিত্যবাবু তুলেওছেন তৃষার কাছে।

বলেছেন—তোমার মেয়েকে নিয়ে ভাবছোতো? তাকে একটা Orfan তে দিয়ে দিলেই চলবে।

কি বললেন? Orfan তে।

হ্যাঁ।

দেখুন জ্যোতিরাদিত্যবাবু। মানুষের সাহস থাকলে সবার ভাল লাগে। কিন্তু

দুঃসাহসীকতা বড্ড খারাপ। তাছাড়া আপনার সাথে সবাই বেশী মিশি বলে আপনি যদি ভেবে ফেলেন তৃষা আপনার হয়ে গেছে, তাহলে জীবনে আপনি সবচেয়ে বড় ভুল করবেন।

তৃষা please যদি কিছু অন্যায় বলে থাকি ক্ষমা করে দিও। আমি বুঝতে পারিনি।

বুঝতে যখন পেরেছেন, তখন আমার কথা বা আমার সম্বন্ধে অযথা কৌতূহল আপনি ত্যাগ করুন। আমাকে চলতে দিন আমার মত করে।

থাকতে পারেননি জ্যোতিরাদিত্যবাবু, বলে ফেলেন—তৃষা আমি তোমাকে ভালবাসি। মুখ ফিরিয়ে নিওনা।

আমি তো বললাম। সম্ভব নয়, আমার ভেঙে যাওয়া ঘরে কাউকে স্থান দিতে আমার ইচ্ছে করে না।

তবু অনুরোধ করছি একবার অন্তত ভেবে দেখ। আমি আশায় থাকব।

ভেবে দেখার ইচ্ছে আমার নেই।

স্কুল থেকে ফিরে এসে অভিষেকের বাঁধানো ছবির কাছে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে তৃষা, বার বার বলছে তুমি আমাকে ক্ষমা কর অভিষেক, তুমি আমাকে শক্তি যোগাও, আমি আর পারছি না।

অনুশ্রুৎ ইংরেজিতে এম এ. তারপর বি-এড করে স্কুলে চাকরী নিয়েছে। ভীষণ ভাল ছাত্র সে, বাড়ী বর্ধমানে। একই বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত অভিষেকও। অভিষেককে চেনে অনুশ্রুত, তারপর P.H.D. করেছে অনুশ্রুত।

কুমারেশবাবু অবসর নিয়েছেন, প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হয়ে গেছে। পরীক্ষা দিয়ে তৃষার স্কুলে এসেছে অনুশ্রুত। অবশ্যই প্রধান শিক্ষক হয়ে। সৌম দর্শণ, স্মার্ট, নিরহংকারী, মিসুকে। সবার কাছে কদিনেই প্রিয় হয়ে গেছেন অনুশ্রুত। স্কুল বোর্ডিং-এ থাকেন অনুশ্রুত। সবাইকে সকাল সন্ধ্যা বিনে পয়সায় পড়ান। সবাই বলে অনুশ্রুতবাবু কেমন যেন অন্যমনস্কতায় ভোগেন বেশীর ভাগ সময়।

কিন্তু কারও সাহস কুলায় না তার ব্যক্তিত্বের কাছে দাঁড়াতে।

স্কুলের আদল পাল্টে দিয়েছেন কয়েক মাসে। অভিভাবকরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ, পঞ্চমুখ ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলের যে কোন অনুষ্ঠানে তিনি যেন একাই একশ। অবাক হয়ে যাচ্ছে তৃষা। এত পরিশ্রমী, এত নিরলস কুমারেশবাবুও ছিলেন না।

স্কুল চলছে, ক্লাশে রয়েছে তৃষা, প্রধান শিক্ষকের ঘরে ফোন বেজে ওঠে।

হ্যালো, হ্যালো।

আমি তৃষাদিদির বাড়ী থেকে বলছি, আপনি কে বলছেন?

আমি প্রধান শিক্ষক বলছি, কেন কি ব্যাপার?

তৃষা দিদিকে একটু বলে দেবেন, তৃণার ভীষণ জ্বর, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক আছে।

ছাড়ছি তাহলে।

দৌড়ে গেছেন অনুশ্রুৎ, তৃষা তখন পড়ানোয় মশগুল।

তৃষা দেবী একটু বাইরে আসবেন?

কি হল স্যার?

বাইরে আসুন তারপর বলছি।

বাইরে আসে তৃষা, ওর ভয় হয়, বোধহয় পড়ানোর কোন ভুল হয়েছে তাই ডাকছেন। তার মনে আসেনি বাড়ীতে কোন বিপদ আসতে পারে, কেননা সে আসার সময় সবকিছু ঠিক ঠাক দেখে এসেছে।

বিনম্রভাবে তৃষা বলে—বলুন।

আপনাকে এক্ষুণি বাড়ী যেতে হবে।

কথাটা শুনেই সিঁদুরে মেঘ দেখে তৃষা বলে—কেন, কি হয়েছে!

আপনার মেয়ের শরীর খুব খারাপ।

একমুহূর্ত অনুশ্রুৎ এর দিকে তাকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে তৃষা। তার মনে আশঙ্কা জন্ম নিয়েছে। কি হল তৃণার, তবে কি! আর ভাবতে পারছেন না তৃষা।

স্যার আমি বাড়ী যাচ্ছি।

কিন্তু যাবেন কি করে।

তাইতো, এখন তো বাস নেই, সেই আড়াইটার আগে, ঘড়ির দিকে তাকায় তৃষা, এখন একটা।

শুনুন আমার মোটর বাঁইক আছে, জ্যোতিরাদিত্যবাবুকে বলে দিচ্ছি উনি দিয়ে আসবেন।

ওনাকে বলতে হবে না, আমি যে কোন উপায়ে চলে যাব।

কোন উপায়ে?

একটা লরি বা যা হোক পেলে।

কেন ওনার সাথে যেতে চাইছেন না, জানতে পারি কি?

বলার সময় নেই, আমি আসছি। যদি সম্ভব হয় ক্লাসটা আপনি একটু দেখবেন।

দাঁড়ান, বিপদের সময় একাতো আপনাকে ছাড়তে পারি না।

অনুশ্রুত চলে গেছেন কমনরুমে, শুভেন্দুবাবুকে বলেন, আমি আসছি, আপনি সামলাবেন কেমন?

কোথায় যাবেন?

ফিরে এসে সব বলব, এখন বলার সময় নেই।

মেদিনীপুরে শিববাজারে তৃষার বাড়ীতে এসেছে অনুশ্রুত। এসে দেখেছে ডাক্তারবাবু স্যালাইন দিয়েছেন তৃষার মেয়েকে। ইঞ্জেকসান দিচ্ছেন, মেয়েটা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। লালা ঝরছে দুগাল বেয়ে। ফিরে আসতে পারেনি অনুশ্রুৎ, ফোন করে শুভেন্দু বাবুকে অবস্থার কথা জানিয়ে বলে দেন, আমার যেতে অনেক দেরী হতে পারে। আপনি সব ব্যবস্থা নেবেন।

জ্বর ছাড়তে সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেছে। মেয়েটা এই প্রথম তাকাচ্ছে। ডাক্তারবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছেন বিপদটা কেটে গেছে তৃষাদেবী। এবার আমি আসছি।

আপনার ....

ও আচ্ছা পাঁচশ টাকা দেবেন।

অনুশ্রুৎ তার পকেট থেকে পাঁচটা একশ টাকার নোট বের করে—এই নিন ডাক্তারবাবু।

এ কি করছেন স্যার, আপনি কেন দেবেন!

তৃষা দেবী, মেয়েটা যদি আমার হত এবং আপনি যদি সেখানে আমার অবস্থায় থাকতেন। তাহলে কি করতেন?

তাই বলে ....

দয়া করে এটুকু আমাকে করতে দেন। কোন দিন তো এমন সুযোগ পাইনি, আজ যখন পেলাম লোভটা সামলাই কি করে!

তার মানে?

আচ্ছা আজ চলি, ডাক্তারবাবু মাঝে মাঝে একটু খবর নেবেন। আসছি তৃষা দেবী।

স্যার একটু দাঁড়াবেন?

কেন?

না থাক, আসুন।

আপনি ইচ্ছে করলে বাচ্চা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত স্কুল নাও যেতে পারেন। কেমন, আচ্ছা আজ তাহলে আসি।

অনুশ্রুৎ বাসায় ফিরেছে রাত্রি তখন দশটা। সমস্ত রাত্রি ভেবেছেন তৃষার কথা, ভেবেছেন তৃষার দুর্বিসহ যন্ত্রণার কথা, দেখেছেন তার এ্যাটাচিতে রাখা পূর্বার ছবি। এইভাবেই কখন যে রাত্রি শেষ হয়ে গেছে তিনি জানেন না।

স্কুল গিয়ে দেখেছেন সব সহশিক্ষকদের চোখের চাউনি বদলে গেছে, বিশেষ করে জ্যোতিরাদিত্যবাবুর। কিছুটা হিংসা, কিছুটা ব্যাঙ্গ তার চোখে।

এতে অবশ্য অবাক হননি অনুশ্রুৎ। সুন্দরী-বিধবা তায় কমবয়সী মেয়ে, চাউনি তো বদলাতেই পারে। এর মধ্যে নতুনত্ব তো কিছু নেই।

অনুশ্রুৎ-এর মন স্কুলে নেই, পড়ে আছে তৃনার কাছে। কি অপূর্ব সুন্দরী, অথচ সে বিকলাঙ্গ, তার সৌন্দর্যের মূল্য নেই। আর তৃষা—সে মাতৃত্বের অধিকার পেয়েছে ঠিকই কিন্তু সে মাতৃত্বে যেন অভিশাপ মিশানো।

ফোন করছেন অনুশ্রুৎ—

হ্যালো কে বলছেন?

আমি তৃষা। আপনি?

আমি অনুশ্রুৎ।

ও স্যার!

হ্যাঁ, কেমন আছে আপনার মেয়ে?

একটু ভাল, স্যার যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব?

বলুন না, সংকোচ করছেন কেন?

আমি দিন চারেক ছুটি চাইছি, দেবেন?

বেশ তো নেবেন।

ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ দেওয়ার তো কিছু নেই। মেয়ে অসুস্থ মা ছুটি নিতেই পারেন। আমার ক্ষেত্রে হলে আমিও নিতাম।

আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

অবশ্যই,

আপনার ছেলে মেয়ে ....

থাকনা ওসব কথা, ঠিক আছে ছাড়ছি।

হ্যালো, হ্যালো ....

অনুশ্রুৎ ফোন কেটে দিয়েছেন, ভাল লাগে নি তার ক্ষতটাকে উসকে দিতে। অথবা ফোনে ওসব আলোচনা করতে।

চারদিন পরে স্কুলে এসেছে তৃষা, সবাই খোঁজ নিয়েছে তার মেয়ের, জ্যোতিরাদিত্য বাবু এবং অনুশ্রুৎ ছাড়া। জ্যোতিরাদিত্যবাবুর ব্যাপারটা নাহয় বোঝা যায়। কিন্তু অনুশ্রুৎ বাবু—তিনি খোঁজ নেননি দেখে আশ্চর্য হয়েছে তৃষা।

স্কুল ছুটি হওয়ার পর সবাই চলে গেছে যে যার বাড়ীর পথে। জ্যোতিরাদিত্যবাবু ভেবেছিলেন তৃষা হয়তো কিছু বলবেন, কিন্তু নিরুত্তাপ তৃষাকে দেখে কিছু না বলে চলে গেছেন বাস স্ট্যান্ডে। তৃষা ধীরগতিতে বাসস্ট্যান্ডের পথে যেতে যেতে ফিরে এসেছে স্কুলে, অনুশ্রুৎ তখনও ডুবে আছেন তার কাজে।

আসতে পারি?

আরে তৃষা দেবী যে, আসুন আসুন, তা বাড়ী যাননি যে এখনও। চলে যাব ভেবেছিলাম। তারপর ভাবলাম মেয়ের খবরটা আপনাকে না দিয়ে যাওয়াটা অভদ্রতা, তাই ফিরে এলাম।

সরি! আমারইতো উচিৎ ছিল খবরটা নেওয়ার, বিশ্বাস করুন এত ব্যস্ত ছিলাম, তাছাড়া আপনিও এমনভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন দেখে আর জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ও তাই, তাহলে আমাকে ধরে নিতে হয় সামান্য সৌজন্য বোধটাও আপনার নেই।

আপনি ভাবতেই পারেন। এবার বলুন তৃণা কেমন আছে?

ভাল আছে বলেই তো স্কুল আসছি।

খুব রেগে গেছেন তাই না?

সাজে না!

কেন একথা বললেন?

নাইবা জানলেন।

বেশ জানব না। আর কি খবর বলুন, কোন problem।

সরি, তেমন কিছু নেই। আমি এবার চলি।

আসুন।

তৃণা বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে। তার বয়স এখন পাঁচ সাড়ে পাঁচ। দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে তৃণা। সে যেন আরও বেশী বেশী abnormal হয়ে যাচ্ছে। মনে সুখ নেই তৃষার। কাজের মেয়েটা যেন ভীষণ ভালবেসে ফেলেছে তৃণাকে। এইটুকুই তৃষার সুখ।

চাকরীটাও হয়ে গেল চার বৎসর। রাস্তাঘাটে, বাসে সবাই যেন লোলুপতা নিয়ে তৃষাকে দেখে। কেউ কেউ পরিচয় করার জন্য চেষ্টা করে। সুযোগ পায় না কেউ, কিন্তু নাছোড় সবাই। পাঁচখুরি থেকে শোভনবাবু আসেন তিনি কেশপুর স্কুলের শিক্ষক, কথায় কথায় পরিচয় পর্ব সেরে দুম করে একদিন প্রস্তাব দিয়ে বসেন, এভাবে আর কতদিন কাটাবেন। অতীতকে ভুলে ভবিষ্যতের প্রশ্নে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরা এ যুগে সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

কি বলতে চাইছেন বলুন তো?

কেন? কথাটাকি খুব জটিল হয়ে গেল, তাহলে সহজ করে বলি। অতীতের স্মৃতি বেদনার, সেই বেদনাকে গলার মালা করে কি লাভ, তার থেকে আসুন না জীবনটাকে নতুন করে শুরু করি।

সে যেন আর এক ঝড়, তৃষা কি করবে, কিভাবে সামলাবে এইসব ঝড়কে। কেন সে তাড়াতাড়ী বুড়ী হয়ে যাচ্ছে না, কেন সে কাউকে বোঝাতে পারছে না, অথবা কেউ বুঝতে চাইছেনা বাস্তব এত সোজা নয়। তবু চেষ্টা করে বোঝানোর।

শোভনবাবু আমি একেবারে বোকা নই। কিন্তু নিজের সুন্দর জীবনকে বলি দিয়ে লাভটা কি হবে। তার থেকে এই যে পরিচয়, মধুর সম্পর্ক এটা কি ভাল নয়।

আমি যে ভীষণ আশা করেছিলাম। বিশ্বাস করুন আমার সামনে, পিছনে কেউ কোথাও নেই, কোন বাধাও নেই।

আপনি কি পারবেন একটা বিকলাঙ্গ মেয়েকে নিয়ে জীবন কাটাতে? পারবেন না। প্রথম প্রথম হয়তো সব ঠিকঠাক চলবে, দিন এগিয়ে যাবে, সমস্যা বেড়ে চলবে, তখন ঐ নিরপরাধী মেয়েটা বিড়ম্বিত হতে থাকবে আপনার কাছ থেকে, হয়তো আমার কাছ থেকেও।

কাউকে না কাউকে কিছু ত্যাগ করতে হয়। সে ত্যাগটা না হয় আপনার মেয়েই করল, তার ভবিষ্যৎ বলে তো কিছু নেই।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল তৃণাকে কোন না কোন সময় আপনি ত্যাগ করবেন, শুরু হবে নতুনত্বের পরিবেশ, আমি মা হয়ে কিভাবে মেনে নেব আপনার প্রস্তাব।

তবু ভেবে দেখুন।

ভাবা হয়ে গেছে শোভনবাবু, তৃণার বিনিময়ে সুখ আমার চাই না। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

তৃষার জীবনে একটার পর একটা ঝড় আছড়ে পড়ছে, তৃষা সে ঝড় ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলেছে বিধ্বস্ত হতে হতে।

তৃষা নির্ভরতা চায়, তৃষা সবকিছু বলে হালকা হতে চায়। কিন্তু কাকে বলবে সে, সবাইতো বিনিময় চায়, স্বপ্ন দেখাতে চায় নতুন জীবনের, তবে কি তৃষা হেরে যাবে!

স্কুলে ছুটি পড়েছে কয়েকদিন হল। তৃণাকে নিয়ে মন্দ কাটছে না তৃষার, তাছাড়া কাটাতে তো হবেই। উপায় তো কিছু নেই।

হঠাৎ অনুশ্রুৎ এসেছে তৃষার বাড়ী—দীর্ঘদিন পরে, অবশ্য মেদিনীপুরে কাজ নিয়েই। তৃণা একটু বড় হয়েছে, তৃণা আরও সুন্দরী হয়েছে। তৃষা তো অবাক!

কি ব্যাপার আপনার এতদিন পরে মনে পড়ল তৃণাকে!

মনে ছিল, কিন্তু আসতে পারিনি।

কেন?

আমাকে আপনার প্রয়োজন নেই বলে। তৃষাদেবী একটা অনুরোধ রাখবেন।

বলুন।

যদি রাখেন তাহলে বলি,

বলে তো দেখুন, অনুরোধটা আগের সব অনুরোধের মত কিনা।

আপনি হয়তো অনেক কিছু ভাবছেন, আসলে তা নয়, বোর্ডিংটা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার তো অনেক বাড়ী, যদি সম্ভব হয় নিচের তলার কিছুটা অংশ ভাড়া দিলে আমার

খুব উপকার হয়। অবশ্য ন্যায্য ভাড়া আমি দেব। আপনার অসুবিধা হবে এমন কিছু আমি করব না।

ছি ছি আপনি কি সব বলছেন। নিজেকে এতখানি হীনই বা ভাবছেন কেন?

জানি এই কথাটাই আপনি বলবেন। আসলে সবাই আপনাকে এমনভাবে চায়, দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে সেই ভয়ে আছেন তো.........., তাই ....

তাই আপনি বিশ্বাস জন্মানোর জন্য উল্টো পথে হাঁটলেন তাই না!

বেশ আপনার মনটা যদি এইভাবে বিষিয়ে গিয়ে থাকে আমি আর বলব না, দেখি অন্য কোথাও কোন ব্যবস্থা করতে পারি কিনা।

ওটা তো আগেও করতে পারতেন। তাছাড়া এখন থেকে স্কুল যেতে অনেক ঝক্কি।

তৃষা কি মন থেকে অপমান করেছিল অনুশ্রুৎ-কে নাকি সব পুরুষের চাওয়া একই, এই ধারণা থেকে পাস কাটানোর জন্য বলেছিল।

তৃষা ভাবে—"আমি ঠিক বলেছিতো। না কি ভুল বলেছি। অনুশ্রুৎবাবু অন্য সবার মত হতেও তো পারেন, যদি তেমন না হন তাহলে ভুল বলা হয়ে গেছে। কি করা উচিৎ ভেবে উঠতে পারছে না তৃষা। সে কি ক্ষমা চেয়ে নেবে। সেইটেই ঠিক সিদ্ধান্ত।

স্কুল খুলেছে, খুব সকাল সকাল স্কুলে চলে গেছে তৃষা, তখন অন্যান্য সহশিক্ষকরা কেউ আসে নি। সোজা বোর্ডিং-এ ঢুকে গিয়ে অনুশ্রুৎ-এর মুখোমুখি হয়েছে তৃষা।

ইশ কি নোংরা সব ঘর। বিছানাগুলোও কি নোংরা। এভাবে কোন ভদ্রলোক এখানে থাকতে পারে?

অনুশ্রুৎকে সরাসরি তৃষা বলে বসে—অনুশ্রুতবাবু।

বলুন?

আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না?

আপনার অপরাধ।

বাড়ীতে যে ব্যবহার করেছিলাম।

না তেমন কিছু তো করেননি। মানুষ যখন নিরাপত্তাহীণতায় দিন কাটায় তখন তো কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না, সেই প্রশ্নে আপনার ব্যবহার তো তেমন কিছু খারাপ ছিল না।

আমি কিন্তু ক্ষমা চাইবো বলে স্কুল শুরুর অনেক আগে স্কুলে এসেছি।

বেশ তো। দেখুন তৃষাদেবী প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে কোন না কোন কারণে একটা শূণ্যতাবোধ তৈরী হয়। মানুষ চায় তা ভরাট করে নিতে। আমি চেয়েছিলাম আপনার তৃণাকে দিয়ে সে শূণ্যস্থান ভরাট করব। চাইলেই যে সব পাওয়া যায় না সে বোধটা আমার আসা উচিৎ ছিল।

অনুশ্রুৎবাবু, বেশ কিছুদিন আগে আপনাকে একটা কথা ফোনের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি এড়িয়ে গেছলেন—

কি কথা?

আপনার ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীর কথা।

একটা দীর্ঘশ্বাস যেন সমগ্র পরিবেশটা বদলে দিল। চোখের কোণ দুটো চিক্ চিক্ করছে অনুশ্রুৎবাবুর। লক্ষ করেছে তৃষা, আমি কি আর একটা অন্যায় করলাম।

নিরবতা ভাঙলেন অনুশ্রুৎ—না, তেমন তো কিছু দেখলাম না।

তাহলে—

আপনি জানতে চান, আপনি শুনতে চান তাইতো, তাহলে শুনুন।

আমি চাকরী পাওয়ার পর বাড়ী থেকে চাপ আসতে শুরু করল আর দেরী নয় একটা বিয়ে করতে হবে এবং সেটা স্বাভাবিক। আমার ভাই, বোন কেউ নেই জানেন, আমি বাবা মা এর একমাত্র সন্তান। বাবা মারা গেছেন অনেক আগে আমি তখন স্কুলে পড়ি। মা বুকে করে আমাকে আগলে রেখে মানুষ করেছেন তার মত করে। পয়সার তো অভাব ছিল না। অসুবিধাও হয়নি। মেয়ে দেখা হল বিয়ে হল পূর্বার সাথে, অপূর্বা বললেও যেন কম বলা হয়। মা খুশি। আর আমি? যেন পৃথিবী জয় করেছি এমন আনন্দে বিভোর। মা বললেন— অনু তোদের তাড়াতাড়ী একটা বাচ্চা হলে আমি শান্তি পাই। বললেই তো হবে না, একটা সমস্যা তৈরী হল পূর্বার, এইভাবে দু বৎসর পর বাচ্চা এল পূর্বার। সে যেন আরও সুন্দরী হচ্ছে দিন দিন। মায়ের আনন্দ যেন বাড়ছে দিন দিন। ননির পুতুলের মত রাখছেন, যত্ন করছেন পূর্বাকে। বাচ্চা হওয়ার সময় হল, নার্সিংহোমে ভর্ত্তি হল। কি হল বোঝার আগে operation table তে মারা গেল পূর্বা, সঙ্গে নিয়ে গেল তার গর্ভের বাচ্চাকে। মা শুনেই অসুস্থ হয়ে গেলেন। তারপর তিন চার দিন পরে পূর্বার সঙ্গী হয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন যে বাচ্চাটা তারা বের করেছিলেন সেটা মেয়ে।

তারপর?

সাধ রয়ে গেল জমা হয়ে, পেলাম না তার স্বাদ।

বিয়ে করেননি?

কি হবে! আবার তো কিছু ঘটতে পারে। হয়তো আরও অপূর্বা পাব, পূর্বাকে তো আর পাব না।

দুঃখিত, অনুশ্রুৎবাবু, না জেনে আপনাকে আঘাৎ করেছি।

জানেন 'দুঃখ' এই তন্ত্রীটা আমার অকেজো হয়ে পড়ে আছে তখন থেকেই, তাই কোন কিছুতে তেমন আঘাৎ পাই না। আপনাকে যে অনুরোধটা আমি করব দয়া করে রাখবেন।

যদি অযোগ্য হই।

পরীক্ষা করে ফেল বলে ঘোষণা করব।

আপনি বেশ রসিকতা করলেন তো, বেশ অনুরোধটা করুন।

আপনি তৃণার কথা ভেবে আমার বাড়ীতে থাকবেন।

ভেবে বলছেন তো?

অনেক ভেবে তবে বলছি। তবে একটা শর্ত থাকবে,

কি বলুন।

আপনি নিচের তলাটা সম্পূর্ণ ব্যবহার করবেন, ভুলবশতও দোতলায় পা বাড়াবেন না।

যে স্মৃতি বেদনার সেদিকে আর পা বাড়ানোর ইচ্ছে নেই তৃষা দেবী।

অনুশ্রুৎ আর তৃণা, অনুশ্রুতের সংসার। কাজের মেয়ে আসে কাজ সারে, রান্না করে চলে যায়, খোঁজ রাখেন না। অনুশ্রুৎ, অবশ্য খোঁজ রাখেন না তৃষার ও। তৃণা সত্যিই অপূর্বা। অনুশ্রুতের আকাঙ্খিত শুকিয়ে থাকা পিতৃস্নেহের গোড়ায় যেন জল ঢালছে তৃণা, কিন্তু সে যে বোবা, সে যে শুনতে পায় না, সে যে বিকলাঙ্গ হাঁটতে, খেতে কিছুই পারে না। কেবল চোখ দুটি দিয়ে সে দেখে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার, কেমন অনুশ্রুৎ। আর অনুশ্রুৎ— সে বোঝার চেষ্টা করে তার চোখ দেখে, কি চায়, কি চায় না সবকিছু।

শর্ত ছিল সকাল পাঁচটা থেকে নটা, সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত্রি দশটা তৃণা থাকবে অনুশ্রুতের কাছে। তৃষা কোনরকম হস্তক্ষেপ করবেনা তৃণা অনুশ্রুতের ব্যাপারে অন্তত ঐ সময়টুকু। কথা রাখছে তৃষা, খোঁজ রাখছে তৃষা তার কাজের মেয়ের কাছ থেকে।

অনুশ্রুৎ তৃণাকে স্নান করান, খাওয়ান, তার বেঁকে থাকা পা দুটোতে নিয়মমাফিক massage করেন সোজা করার চেষ্টা করেন—যেভাবে ডাক্তারবাবু দেখিয়ে দিয়েছেন। ঈশারায় বোঝানোর চেষ্টা করেন প্রতিটি ব্যাপার। অনুশ্রুৎ ছবির বই কিনে এনেছেন। অনুশ্রুৎ খেলনা কিনে এনেছেন রং বেরঙের, বিভিন্ন শব্দময়।

ছবি দেখানোর সময় ঈশারায় বুঝিয়ে দেন সেটা কি। খেলনাগুলো ব্যবহারের সময় তার হাত টেনে নিয়ে ধরিয়ে দেন। এইভাবে কঠোর অধ্যাবসায়ের মধ্যে থেকে যেন আবিষ্কারের আনন্দ পাচ্ছেন অনুশ্রুৎ।

তৃষা জানে না তৃণার উন্নতির খবর এবং অদ্ভুৎভাবে তৃণা যখন রাত্রিতে আসে তার মায়ের কাছে আগের মতই হয়ে যায়।

মাস কাটে, বৎসর কাটে অনুশ্রুতের চেষ্টার গতি বাড়ে দ্বিগুণ থেকে বহুগুণ। মাঝে মাঝে ইচ্ছাকৃতভাবে স্কুল ছুটি নিয়ে নেন অনুশ্রুৎ। সেদিন তিনি তৃণাকে নিয়ে চলে যান

ডাক্তারের কাছে, তার উন্নতি, অবনতী অথবা পরবর্তী পদক্ষেপের আলোচনা সেরে ফিরে আসেন বাড়ীতে। তৃষার কাজের মেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে দায়ীত্ব হালকা হওয়ায়। সে কাজ সেরে চলে যায় তার বাড়ী।

স্কুলে, স্কুলের বাইরে চলছে সমালোচনার ঝড়। ইতিমধ্যে বিয়ে করেছেন জ্যোতিরাদিত্য বাবু, সুযোগ পেলে তৃষাকে কটাক্ষ করতে ছাড়েন না, অনুশ্রুতের কাছে অভিযোগ জানালে তিনি এড়িয়ে যান—আপনি আপনার কাজে মন দিন তৃষাদেবী। কোন অভিযোগ করতে আসবেন না।

সবাই আজে বাজে বলবে আর আমি—

চুপচাপ থাকবেন, এটাই আমার অনুরোধ।

সমালোচনার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন, বাধ্য হয়ে তৃষা এসেছে অনুশ্রুতের কাছে।

স্যার আমি ভাবছি চাকরী ছেড়ে দেব।

কেন?

সবকিছু সহ্যের সীমা আছে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

আপনি জীবন যুদ্ধে হেরে যাচ্ছেন তৃষাদেবী। কোন পরাজিতাকে আমি প্রশ্রয় দিইনা, তবু বলব আপনি চুপচাপ থাকুন। বাজে ভাবনা মন থেকে সরান। দেখবেন একসময় সমালোচনা থেমে গেছে। হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে তৃষা।

Teacher counsil এর মিটিং চলছে। হঠাৎ প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছেন সৌমেনবাবু, অবশ্যই প্ররোচনাটা ছিল জ্যোতিরাদিত্যবাবুর। সব মন দিয়ে শুনেছেন অনুশ্রুৎ, তারপর বলেছেন—আর কোন কিছু বলার আছে?

সেতো আপনি বা আপনারাই জানেন!

ধরুন যদি Regignation দিয়ে দিই, তাহলে আপনারা খুশী হবেন তো।

স্কুলের পরিচালন কমিটির সম্পাদকের হাতে অনুশ্রুৎ তুলে দিয়েছেন তার পদত্যাগ পত্র। পদত্যাগ পত্র খুলে তিনি অবাক হয়ে গেছেন। সেখানে কারণটাও জানানো আছে। আর জানানো আছে জ্যোতিরাদিত্যবাবুর তৃষার প্রতি ব্যবহারের বিবরণ। সম্পাদক অরুণাংশু বাবু জ্যোতিরাদিত্যবাবুর কাছে জানতে চেয়েছেন ঘটনার সত্যতা। তৃষার কাছে জানতে চেয়েছেন তার সত্যতা। সিদ্ধান্ত হয়েছে কোন দিন কোন অবস্থাতে যদি কেউ তৃষাকে টিজিং করে তাহলে তার বিরুদ্ধে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অরুণাংশুবাবু অনুশ্রুৎকে বলেন আমি আপনার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে পারলাম না। একটা অনুরোধ, আপনি একটু শক্ত মানসিকতার হওয়ার চেষ্টা করুন।

মিটিং শেষ হয়েছে, শেষ হয়েছে তৃষার জীবনে ওঠা একটা বড় ঝড়। কিন্তু শোভন,

সে যে অস্থির করছে তৃষাকে, সে ঝড় থামবে কিভাবে? তবে কি অনুশ্রুৎকে বলবে, ভাবতে পারছে না তৃষা।

তৃণা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটছে, তৃণা তার হাতে জোর পাচ্ছে, নরম নরম, এলোমেলো হাতে শ্লেটের উপর লিখে দেওয়া হরফে চক্ পেন্সিলের আঁচড় টানছে তৃণা।

অনুশ্রুৎ একটা অসম্ভব কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, সে যুদ্ধে জয়ের সংকেত পাচ্ছে খুব ধীর লয়ে। তৃষা জানতে পারছে তার কাজের মেয়ের কাছ থেকে। কিন্তু তৃণা তার মায়ের কাছে এভাবে গুটিয়ে থাকে কেন? কেন ঘুম থেকে উঠে ছট্‌ফট্ করে অনুশ্রুতের কাছে যাওয়ার জন্য।

সেদিন স্কুল ছুটি নিয়েছেন অনুশ্রুৎ, তৃষা তৈরী হয়েছে স্কুলে যাওয়ার জন্য, কি মনে হল, বেরিয়েও ফিরে এসেছে তৃষা। আজ সে দেখবে অনুশ্রুৎ কি করে। তৃণা কি করে, কিন্তু কিভাবে। সে তো নিজেই শর্ত আরোপ করেছিল, কোনদিন কোন অবস্থাতেই অনুশ্রুৎ যেন দোতলার পথে পা না বাড়ায় তার মনে হয় অনুশ্রুৎকে ঠিকই শর্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নিজের নিচে নামা চলবে না এমন শর্ত তো চাপিয়ে নেওয়া হয় নি।

অনুশ্রুৎ মশগুল হয়ে আছেন তৃণাকে নিয়ে, তার হাতে লাঠি, লাঠি তৃণার হাতেও। অনুশ্রুৎ লাঠিতে ভর দিয়ে বিকলাঙ্গের মতই হাঁটছেন। তৃণা দেখছে, তারপর লাঠি নিয়ে হাঁটছে অনুশ্রুতের পিছনে, অনুশ্রুৎ লাঠিটা ছেড়ে হাঁটা শুরু করেছেন, তৃণা ফেলে দিয়েছে তার লাঠি, হাঁটছে অনুশ্রুতের সাথে, পড়ে যাচ্ছে আবার উঠছে, আবার হাঁটছে।

তাদের দুজনের লক্ষ নেই কোথায় কে এসেছে। কোথায় কি ঘটছে। শেষ হয়েছে হাঁটা, তৃণা ঈশারা করছে অনুশ্রুৎকে জল খাবে বলে, জল এনে দিচ্ছেন অনুশ্রুৎ,

তৃষা দেখছে আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে—কি করে এসব সম্ভব। কেনই বা তৃণা মাকে ছেড়ে এখানে আসার জন্য ছট্‌ফট্ করে।

সব যেন রুটিন মাফিক করছেন অনুশ্রুৎ, তৃণার খাওয়া শেষ হয়েছে। বই নিয়ে বসেছে তৃণা, ইংরেজী বই। অনুশ্রুৎ এক একটি অক্ষর দেখাচ্ছেন—লিখছে তৃণা। ভুল হলে তাকাচ্ছে অনুশ্রুতের দিকে। অনুশ্রুৎ তখনই তাকে আদরে ভরিয়ে দিচ্ছেন,—বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন তার ভুলগুলো কিভাবে সংশোধন করতে হবে।

তৃষার চোখে জল—তৃণার উন্নতির আনন্দে। তৃষার চোখে জল অনুশ্রুৎকে ভুল বোঝার অনুশোচনায়, তৃষার চোখে জল এমন একটি মানুষের প্রতি—যে অন্য কারও মত নয় যার উপর নির্ভর করা যায় তার জন্য। তৃষার চোখে জল—যে অভিষেকের অভাব তার মেয়ের কাছে ছিল তা পূরণ হওয়ার তৃপ্তিতে।

দোতলায় ফিরে গেছে তৃষা। সমস্ত দিন এক অদ্ভুত উদাসীনতায় কাটিয়ে সন্ধ্যায় কাজের মেয়েকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে অনুশ্রুৎকে। অনুশ্রুৎ তখন তৃণাকে ইংরেজী লেখা শিখাচ্ছেন। কি করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না অনুশ্রুৎ, দীর্ঘ দিন প্রায় সাত বৎসর এখানে থাকার পর এই প্রথম তৃষা ডেকে পাঠাল অনুশ্রুৎকে, অনুশ্রুৎ ঈশারায় জিজ্ঞাসা করেন তৃণাকে, বোধহয় তৃণা বুঝতে পেরেছে, অনুশ্রুতের একটা আঙ্গুল ধরে টান মারে। অনুশ্রুৎ বোঝেন সে কি বলতে চাইছে। এক রাস উৎকণ্ঠা নিয়ে দোতলায় এসে দেখেন তৃষার চোখে জল।

কি হল তৃষাদেবী আপনার চোখে জল কেন ? কেনই বা আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন ?

সময়টা বৈশাখের মাঝামাঝি, হঠাৎ হঠাৎ কালবৈশাখী হানা দেয় মানুষের পৃথিবীতে। সেদিনও মেঘ ধরেছে, হঠাৎ নিভে গেছে বিদ্যুতের আলো, ঝড় উঠছে পশ্চিম আকাশ থেকে, তীব্রতার গতি, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। কাজের মেয়ে আলো জ্বেলে এনে রেখে দিয়েছে তৃষার পড়ার টেবিলে, তারপর চলে গেছে রান্নাঘরে, তৃণা ভয় পেয়েছে, ঘন ঘন বিদ্যুতের আলো দেখে, ঝড়ের তান্ডব দেখে মুখটা গুঁজে দিয়েছে অনুশ্রুতের বুকে। সমস্ত শরীর লেপটে আছে অনুশ্রুতের শরীরে। কেউ কোন কথা বলছে না। ঝড়ের গতি বাড়ছে তো বাড়ছেই, বৃষ্টির দেখা নেই। সাথে তীব্র মেঘের গর্জন।

তৃণা একবার মুখ তুলছে অনুশ্রুতের বুক থেকে আবার মুখ লুকাচ্ছে বুকে।

হ্যারিকেনের আলোয় তৃষা দেখছে অনুশ্রুতের চোখ বাইরে ঝড়ের দিকে, বিদ্যুতের আলোর দিকে। তৃণা আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে অনুশ্রুৎকে।

অনুশ্রুৎ, অনুশ্রুৎ, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো।

বলো,

তুমি কি জানো পৃথিবী শান্ত হবে।

শান্ত হবে তৃষা। পৃথিবী আবার শান্ত হবে, ঝড় থেমে যাবে যে কোন সময়।

একটা কথা বলব, অনুশ্রুৎ।

বলো।

অভিষেকের স্থানটা তুমি কি নেবে ?

ঝড়টা থামছে আস্তে আস্তে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে না আর, বৃষ্টি নামছে ঝির ঝির। বৃষ্টি নামছে মুসলধারে। হ্যারিকেনের আলোয় দেখা যাচ্ছে ঝড়ের শেষে বৃষ্টিটা কি সুন্দর।

অনুশ্রুৎ কি ঈশারা করল কে জানে, তৃণা তার নরম হাতটা বাড়িয়ে দিল তৃষার দিকে। তার চোখে মুখে নরম হাসি।

হারান বাগদী

নিরামিষ খেতে খেতে মুখটা একবারে তিতাবিতা হয়ে যাচ্ছে হারান বাগদীর। সাত জন্মে যার বাড়ীতে এভাবে কেউ খায় না। নিদেন পক্ষে গেঁড়ি গুগলি, তাও না যদি জোটে বিশেষ করে চৈত্র-বৈশাখে পুকুর, ডোবা, খাল যখন শুখিয়ে যায় তখন মুখে স্বাদ ধরে রাখার জন্য ব্রয়লার মুরগীর খালপোষ করা ছাল চামড়া, ভুঁড়ি অন্তত নিয়ে আসে হারান।

বাচ্চাকাচ্চাগুলোও হয়েছে তেমন খেতে বসে যদি দেখতে পায় আমিষ নেই—অমনি ন্যাংটো হয়ে নাচ শুরু করবে, ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। যেন লঙ্কা কান্ড, সঙ্গে সঙ্গে তাদের মা কাঁদনী হাত তো হাত, পা তো পা, হাতের কাছে যা পাবে দেবে পিঠের উপরে, গলা তো নয় বাপরে বাপ যেন কাঁসর ঘন্টা!

হারান বলত মাগীর তেজ আমাকে জ্বালিয়ে খাক করে দিল। শরীর তো নয় যেন ছোটোখাটো হাতী। আর সবার সাথে ঢলাঢলি। পাড়ার ছোকরাগুলোতো তার পায়ে পায়ে। লোকে বলে কাঁদনী বাগদী তো নয়—যেন খানকী মাগী।

হারানের সব ভাল এক ঝিলিম খেলেই হল। পেটের কথা সব বেরিয়ে যাবে গুড় গুড় করে। বাদ যাবে না একটিও শব্দ।

সেদিন সন্ধ্যায় ভান্টু, কেলো, চরখী সবাই বসেছে ঠেকে, কলকে ভান্টুর হাতে। একে একে সবাইকে দিচ্ছে, সুখ টান দিয়ে আবার ভান্টুর হাতে।

কেলো সদ্য বিয়ে করেছে—একটু বেশী বয়সেই। সেও বিয়ের আগে ঘুর ঘুর করতো কাঁদনীর পিছনে। সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই ঐ লোকের বাড়ীতে কাজের সময় বাদে। কাঁদনীও তাকে দিয়ে মেয়েলি কাজ করিয়ে নিত, একটু ফস্টিনস্টিও করত। ক্ষতি আর এমন কি হবে। দেওর বইতো অন্য কেউ নয়।

চোখ নেশা হয়েছে হারানের, ভান্টুর, কেলোর, চরখীর। চরখী জিজ্ঞাসা করে হারানদা তোমার বৌদির সাথে প্রথম রাতটা যদি বলতে?

আর বলিস না—সে কথাই বলছে না, কেবল যেন কি খুঁজছে এদিক ওদিক তাকিয়ে। মাঝে মাঝে এপা একবার মুড়ে বসে আবার খুলে যেয়, ও পা মুড়ে বসে, আবার খুলে দেয়। যেন ডাংপিটা গরুর মত।

কেলো জিজ্ঞাসা করে—তারপর?

তারপর আর কি, আমি তো সব কিছুর মাথা খেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আমাকে তোমার পছন্দ তো?

ভান্টু একটু গলা খ্যাঁকর দিয়ে বলে—সে কি বলল?

ওরে বাবা! সে যেন ইয়া বড় কাঁসার ঘন্টা বাজল অথবা মনে হল হাত থেকে

গাদাগুচ্ছের কাঁসার ডিশ্ পড়ল পাকার মেঝেতে, বলে কিনা পছন্দ লয়তো কি এমনি করলুম। ইস্ কথা তো লয়, কি পুরুষ রে বাবা।

চরখী জিজ্ঞাসা করে—তারপর?

ফুলশয্যা বলে কথা, কত আদর করে কত কথা বলব, আরও কত কি—সব যেন উড়ে গেল ফোন পেয়ে। কি বলল জানিস্, ঐসব পছন্দ টছন্দ লয়—হলেই হল। ঐ যে পটলা ও যে গো বাউরী চুল আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিল ছাদনা তলায়, ঐ পটলা আমাকে বিয়ে করবে বলেছিল, সে করেনি। উঃ কি লোক মাইরি, কি ভাল যে বাসত সে বলতে পারবনি।

চরখীর চোখ তো ছানা বড়া—সে কি গো হারানদা একবারে পোড় খাওয়া।

শুননা, শুধু কথা বলছে।

চরখী মুখে চাপা দেয়—আচ্ছা বল।

বলে কিনা পটলার কি হল কে জানে তার বন্ধুকে সঙ্গে লিয়ে একদিন সন্ধ্যায় হাজির। কি যে নাম সব। ওহো পুটকা। দিল আমার কাছে ঠেলে, পটলা হাওয়া। তবে পুটকা পটলার মত লয়, যেন হাঁপানী রুগী।

কেলো—এত?

নারে— বলে কিনা যেয়ে মরুগগে যাক তুমি তো করেছ, তাহলেই হল।

তো আমি বললাম তুমি তো দেখছি দশ ঘাটের জল খেয়ে এখানে এসেছ। বলে কিনা তুমি কিসে কম যাও বাপু। কত জনের ঘর ঢুকেছ তার আর কে জানে।

আমি বললাম—যত সব বাজে কথা।

বলে কিনা—তা বলবে বইকি। সব জানা আছে আমার। আর ভাল লাগেনি, লাওতো শুয়ে পড়ো দিখিনি। দেখি তোমার কত ক্ষ্যামতা।

ভান্টু বলে, হারান তোকে তাহলে অনেক ধকল নিতে হয়েছে।

আর বলিস না—তার সে কি রূপ মাইরি, মনে হল পালাই বাবা। দরজা খুলে পালাতেই গেলাম, ধরল হাতটাতে তারপর এক ঝটকায় ফেলল মেঝেয়। ওরে বাপরে রূপ তেজতো নয় যেন তাড়কা রাক্ষসী মানুষ খাচ্ছে চিরিয়ে চিবিয়ে।

হারান বাগদী জন খাটে এর ঘরে ওর ঘরে, রোজগার মন্দ না চলে যায় মোটামুটি। বৌউটা খানকী হলে কি হবে কাজ করে খুব। যাদের বাড়ীতে কাজ করে এক পয়সাও ছাড়ে না। ঝগড়া লেগে যাবে মুনিবদের সাথে, চালের ওজন ঠিক্ ঠিক্ না দিলে বাড়ীর গিন্নী মায়ের বাপের শ্রাদ্ধ করে দেবে। এত সব জ্বালানোর পরেও ডাক ঐ কাঁদনীর। বুঝলে মাস্টার দা—লোকে বলে কাঁদনীর মত দায়ীত্ব নিয়ে কেউ কাজ করে না, ফাঁকীবাজী নেই।

হিসেবের কাজ, কাজ না থাকলে এ বাড়ীতে চাল পাছড়ে, ও বাড়ীতে ঘুটো দিয়ে দেয়, সে বাড়ীতে বালতি বালতি জল এনে দেয় বিনিময়ে অবশ্যই পয়সা।

সব ভাল, রোগ দুটি— রাত্রে ঘুম কামাই, দিনের বেলা চন্ডপামানো।

বুঝলে মাষ্টার দা এই হারাণ বাগদী একটু শান্তি পেল বাচ্চা হওয়ার পরে। তাও একটা আধটা নয়, পাঁচ পাঁচটা।

বলো কি হারান—তুমি এই বয়সে পাঁচ ছেলের বাবা। ঢের বলেছিলাম—তখন দুটি, কাঁদনী এবার অপারেশন হয়ে যাও, বলে কিনা কেন অপারেশন হব। গতর কি চলে গেছে যে খাওয়াতে পারব না। তিন নম্বর হল বললাম কাঁদনী সরকারের দেওয়া বড়ি খাও। ওরে বাবা ওকে খেলে রোগে রোগে মরে যাব, আমি খাবনা বাবা। এইভাবে চতুর্থ হল, পঞ্চমও হল। অবশ্য ষষ্ঠ বাচ্চাটার খবর হারান জানে না।

সময়টা ২০০১ সাল। কেশপুর লাইন নামে বদলা নেওয়া চলছে পাঁশকুড়া লাইনের। ধুম লড়াই চলছে গাঁয়ে গাঁয়ে, সবাই পালাচ্ছে, কেউ ভয়ে কেউ কাজকর্মের অভাবে। সবার সাথে আমি পালালাম। ও যে বিরোধী দল করি গো। কাঁদনী রয়ে গেল পাঁচ ছেলে নিয়ে গাঁয়ে, মেয়েদের তো আর কিছু হবে না। তাছাড়া বিশ্বাস ছিল কাঁদনী যা মেয়ে ও ঠিক বুঝেসুঝে নেবে। ঘরের খোঁজ নিতেও যেতে পারিনি। কি হচ্ছে না হচ্ছে তারও খবর নেই, প্রথমটা যদিও দু একজন দিচ্ছিল। তারাও আর দেয় না। ভানু, কেলো, চরখি ওরা যে কোথায় তাও জানি না। সাহস কোথায়, গেলেই বিপদ। পড়ে আছি দেশে। কেশপুর ছেড়ে বিদেশ বিভুঁয়ে, মনটাতো শুধুই খারাপ হয়ে যাচ্ছে ছেলেগুলোর জন্য।

যেতে তো পারতে।

ওরে বাবা, কি কুক্ষনে যে বিরোধী দল করলাম কে জানে। শালাদের না আছে দল, না আছে বল, কেবল ফাঁকা বুলি, আর হ্যান করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা। আমরা সব গরীব, আমাদের কি আর ওসব চলে। আর যারা বড়লোক বেশ নিশ্চিন্তে আছে, তাদের জন্য সব পক্ষই মোতায়েন।

তাহলে তো তোমার বেশ বিপদ।

একদিক দেখলে তাই। তবে একদিকে ভালই।

কেন?

ও যে গো, কাঁদুনী—ওর কথার জ্বালায় দিনে যন্ত্রণা, অন্য জ্বালায় রাতে যন্ত্রণা। অন্তত তার হাত থেকে তো বাঁচোয়া।

দু বৎসর পার হয়ে গেল দেখতে দেখতে। হারানের আর ঘর ফেরা হয় নি, যারা গেছল গা গতরে ব্যাথা, ঠাং হাত ভাঙা, জমি জমা হারিয়ে কেউ কেউ ফিরে এসেছে, আবার কেউ কেউ নিখোঁজ হয়ে গেছে কোথায় কে জানে। যাদের সংসারে বাচ্চাকাচ্চা ছিল

তাদের বৌগুলো সংসারের জীবন্তগুলোকে নিয়ে হয় বাপের বাড়ী নয়তো নিরাপত্তাহীনতার নিরাপত্তায় দিন গুনছে ভয়ে ভয়ে কোনরকমে। অবশ্য এদের সবাই গরীব, হারানোর তো তেমন কিছুই নেই, তবু হারিয়েছে যেটুকু ছিল। যারা বেশ চালাক চতুর তারা হাত মিলিয়েছে। পা মিলিয়েছে, মন মিলেয়েছে, কখনও কখনও শরীরও মিলিয়েছে লজ্জার মাথা খেয়ে, না খেয়ে তো আর বাঁচা যায় না।

এসব খবর প্রথম প্রথম কেলো দিত কেশপুর থেকে ঘুর পথে এসে। তারও আর পাত্তা নেই। গোপন আস্তানায় এসবই আলোচনা হয় মাষ্টারের সাথে।

মাষ্টারদা সব কিছু শুনেছে হারানের কাছে—জিজ্ঞাসা করে তোমার কাঁদুনীর খোঁজখবর পাওনি?

কি করে পাব মাষ্টার দা—তবে সে যা মেয়ে তার উপর সবাই তাকে যা বিশ্বাস করে, ভালবাসে, মনে হয় চালিয়ে নিচ্ছে কোনরকমে।

তোমার যেতে ইচ্ছে করে না?

করে না আবার—ঐ বাচ্চাগুলোর জন্য মনটা শুধুই খারাপ হয়ে যায়। সব ঠান্ডা হোক, তারপর যাব। গিয়ে হাতে পায়ে ধরে তাদের সাথে হাত মিলিয়ে দু পয়সা কামিয়ে একটু হাল ফেরানোর চেষ্টা করব।

যদি ওরা রাজী না হয়?

দেখা যাবেখন। আচ্ছা মাষ্টার দা—তোমাদের ওখানেও সব কি একই অবস্থা?

তা না হলে কি এখানে পড়ে থাকি?

তোমার বাচ্চা কাচ্চা, বৌ—এদের খবর?

সবাই বাপের বাড়ীতে আছে।

তাহলে তুমি তো ওখানেই চলে যেতে পার?

পারি, কিন্তু ওখানেও যে লোক যাচ্ছে?

খবর পেয়েছ?

তা না হলে কি এমনি এমনি বলছি।

এইভাবে তিন বৎসর কেটে গেল, সে দিন আর কোনভাবেই ফিরছে না।

আচ্ছা মাষ্টার দা—কি হল বলতো, পরিবর্তন কি হবে না।

কি জানি, খবরের কাগজ তো পড়তে জাননা, দেখতে পেতে যারা যাচ্ছে তাদের সন্ত্রাসবাদী বলে হয় জেলে পুরছে না হলে জন্মের মত খালাস করে দিচ্ছে।

হবে নাই বা কেন—কম মার কাটারি বাড়ছে। বলে কিনা রাতারাতি বদলে দেবে, আরে বাবা লোক কোথায়, গোখুরার ল্যাজে পা দিলে তার ফল যা হয় তাই হচ্ছে। ওদের আর দোষ কি? আমরা যেমন গন্ড মূর্খ!

মাষ্টারদাও যায় নি তিন বৎসর সে এখন হারানের সর্বক্ষণের সাথী। হারানের গাঁয়েও এক মাষ্টার ছিল নাম তার সবুজ মন্ডল। ওর পাল্লায় পড়েই তো আজ এই অবস্থা।

তখন উপনির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়েছে। কোথা থেকে এক মেয়ে মানুষ এসে দিল সব মাতিয়ে। সবুজ মাষ্টারের ঘরে দিনরাত মিটিং, কত মানুষের যাতায়াত, তাদের মধ্যে কত যে বাজে লোক তার ইয়ত্তা নেই, তাদের হাতে কত সব অস্ত্র।

হারান তো সরল সাদা মানুষ, গাঁয়ের সবাই ভালবাসে ওর বৌ আর ওকে, ডেকে পাঠাল সবুজ মাষ্টার।

কি খবর মাষ্টার, ডেকেছ কেন?

তোমাকে যে কিছু দায়ীত্ব নিতে হবে?

আমাকে, কিসের!

দেখছনা—কি সব অত্যাচার, অনিয়ম চলছে, গরীবদরদী সেজে সুবিধা ভোগ করে তোমাদের শোষণ করছে।

তেমন তো কিছু দেখিনি মাষ্টার।

সে কিগো। তোমরা জমি পেয়েছ?

না তা পাইনি।

অথছ দেখ পরান, কিস্মত—ওদের জমি থাকতেও ওদের নামে পাট্টা হচ্ছে।

তা অবশ্য হচ্ছে।

দিনকে দিন জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে।

তা বাড়ছে।

তোমরা সব জায়গায় ওদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পার?

না তা পারি না, বললে নিয়ে গিয়ে রামধলাই দিচ্ছে।

তাহলে, তোমার দায়ীত্ব নেই—প্রতিবাদ করার।

কিন্তু ....

আমরা তোমার পাশে, ওদের দল ছেড়ে এদিকে চলে এস। তো তোমার সংসার ভালভাবে চলছে তো?

ঐ কোনরকমে।

কিছু টাকা পয়সা রাখো, দরকার হলে আরও পাবে।

সেই শুরু—হারান এখন দলের নেতা।

কাঁদুনী মানা করেছিল, কিন্তু শোনে নি হারান, তার ফল আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

সেই এক মাষ্টার দা, আর এখানে এক মাষ্টার দা—হারান জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁগো মাষ্টার দা তোমার ব্যাপার কি?

আমি বরাবরই ঐ কংগ্রেস করি। কিন্তু সবাই তখন সঙ্গে ছিল। কি যে হল, কেন যে হল, বুঝতে পারলাম না, সবাই ছেড়ে গেল আমাকে। শুধু তাই নয়, একদিন খেতে বসেছি একদল লোক এসে ডেকে নিয়ে গেল। তার মধ্যে আমাকে ছেড়ে যাওয়ারাও ছিল, নিয়ে গিয়ে বলে দিল এক ঘন্টার মধ্যে গ্রাম ছেড়ে না গেলে জানে শেষ করে দেব। জানের দায় কঠিন দায়, বিবি, বাল বাচ্চাকে তার আবার ঘর পাঠিয়ে চলে এলাম এখানে।

তো মাষ্টার দা তুমি কি ছেলেপুলে পড়াতে?

আরে না না, আমি মাষ্টার ছিলাম না কোন কালেই, দরজীর ব্যবসা করতাম, ঐ কাটা ছেঁড়া শেলাই, তার সাথে দু চারটে নতুন জামা, প্যান্ট, পাঞ্জাবী কাটানো এই সবই করতাম। তো দেখে শুনে পাড়ার কয়েকটা ছেলে বলল আকমল চাচা, আমাদের সেলাই শেখাবে? তো বললাম, আসিস তবে। ওরা আসত আর যেহেতু আমি শিখাতাম, আমাকে মাষ্টার বলত। কবে যে আকমল শেখ মাষ্টার হয়ে গেল এর বেশী কিছু জানি না।

তুমি রাজনীতিতে ঢুকলে কেন?

ছিলাম, তবে সক্রিয় ছিলাম না, সবাই ধরল, আকমল ভাই তুমি যদি নেতৃত্ব দাও, ভাল হয়, তোমার তো সবার সাথে ভাল সম্পর্ক, তোমাকে সবাই নেবে। ব্যাস শুরু হয়ে গেল। মিটিং, মিছিল, সব এল্যাহি ব্যাপার। আমিও যেন হাতের চাঁদ পেলাম, মানুষ আসে তাদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে, মানুষ যায় সমাধানের পথ জেনে।

তোমার ব্যবসা?

সেও চলে রমরমিয়ে।

টাকাপয়সা তো ভালই আসত, সেগুলো?

বিভিন্ন কাজে লাগাতাম, বিপদে আপদে দিতাম। বিনিময়ে তারা আসত, আমার দোকানে, আমারও তখন পাঁচ সাত জন ছেলে রাখা হয়ে গেছে, তারা কাজ শিখে কাজ করে, রোজগার ভালই হয়। লোকে বলে টাকা মেরে বাড়ী করেছি?

এসবও বলত!

বলবে না আবার, মানুষের মন তো! কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, থাকতাম একচাল ঝিটে বেড়ার ঘরে, দু তিন বৎসরের রোজগারের টাকায় দু কামরা একটা বাড়ী করলাম, খেতে পেতাম না ভাল করে। স্বাচ্ছন্দ এল।

তাহলে তো সবাই বলবেই।

আর ওখানেই হল কাল! কোথা থেকে যে কি হল বোঝবার আগেই ঝড় উঠল, উড়ে গেল সব প্রতিরোধ, যারা পাশে ছিল ছেড়ে চলে গেল, রাতের অন্ধকারে বিবি বাচ্চাকে তার আব্বার বাড়ী পাঠিয়ে চলে এলাম এখানে।

মাষ্টার!

কি আর বলব, সবই ভুল, গরীবদের ঘোড়া রোগ হতে নেই যখন বুঝলাম, তখন তো সব বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। ফিরিয়ে যে আনব তার খেসারৎটাও খুব বেশী!

ভীষণ মন খারাপ মাষ্টারের—দেখতে ইচ্ছে করছে বিবিকে, তার একমাত্র বাচ্চাকে।

ভাল লাগছে না হারান ভাই, মনে হচ্ছে যেন কত যুগ দেখিনি, যাবে যে তারও উপায় নেই।

আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না মাষ্টার।

কি কাজ?

তুমি আমাদের বাড়ী যাবে, আমি তোমাদের বাড়ী।

কথাটা মন্দ বলনি। কিন্তু কেউ তো কাউকে চেনে না। অবশ্য আমার বিবি লেখাপড়া একটু আধটু জানে। চিঠিতে লিখে দিলে বুঝতে পারবে।

কাঁদনীতো ক-অক্ষর গোমাংস, কিছুই জানে না, কি উপায় হবে। বড় বাচ্চাটা অবশ্য পড়ছিল। এখন কি করছে কে জানে।

সে নিশ্চয় ছেড়ে দেয় নি। তাহলে এক কাজ করা যাক, দুজনেই চিঠিতে পরিচয় পত্র লিখে নিয়ে জেনে আসব চল, সবার খবর।

কবে যাবে?

ঐ তো দিন সাতেক পরে কলকাতায় বিরাট জমায়েত। তারপর রাতভর সম্মেলন, সবাই বেরিয়ে যাবে রাত থেকেই। ঐদিন যেতে হবে।

কিন্তু যাব কি করে? গাড়ীতো কম থাকবে।

সে হবেখন। আচ্ছা তোমার বাড়ীতো এখান থেকে কুড়ি বাইশ কিমি তাই না? আমার একটু বেশী। সাইকেলে গেলে কেমন হয়।

মন্দ বলো নি। এখানে সাইকেল তো আছেই।

সেদিন চতুর্দিকে সাজো সাজো রব, ব্রিগেডে জামায়েত, রাস্তার যত গাড়ী তার প্রায় সবই সংরক্ষিত। মাইকে প্রচার চলছে মিছিল সহকারে। "দলে দলে যোগদান করুন।" সন্ধ্যা থেকে গাড়ী বোঝাই হচ্ছে, কেননা আগে পৌঁছাতে হবে। হারান বা মাষ্টারের ঘর সাইকেলে বড়জোর দেড় ঘন্টার দু ঘন্টার পথ। রাত্রি তখন নটা সাড়ে নটা।

হারান ভাই, এবার বেরিয়ে পড়লেই তো হয়।

কিছু কেনাকাটা করেছ?

যেটুকু ছিল তাতে বাচ্চাটার একটা জামা নিয়েছি।

আমার তো কিছুই নেই।

দু পথে বেরিয়ে পড়েছে হারান এবং মাষ্টার। হারানের গ্রামে ঢুকে একটা আধা বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করে হারানের ঘরের ঠিকানা নিয়েছে মাষ্টার। অচেনা জায়গা, অচেনা ঘর, অচেনা

মানুষ, ভয় করছে মাষ্টারের। একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে মাষ্টার জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁগো এখানে হারান বাগদীর বাড়ী কোনটা?

সন্দেহের চোখ মেয়েটির। জিজ্ঞাসা করে কোথা থেকে আসছেন?

আসছি মেদিনীপুর থেকে!

সে তো আজ তিন বছর এখানে নেই।

মিথ্যার আশ্রয় নেয় মাষ্টার—কোথায় গেছে?

তা তো জানি না, সেই গন্ডগোলের পর থেকে আর গাঁয়ে আসে নি।

কোথা পাব?

বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও জানা নেই।

তার বাড়ীতে সব আছে তো?

ঔ তো বাড়ী চলে যান।

আমি তো ঠিক চিনি না। ওদের বিয়ের পর থেকে আর এখানে আসাও হয় নি। যদি দয়া করে একটু ডেকে দেন তো ভাল হয়।

আচ্ছা, চলুন তবে।

মেয়েটি যে বাড়ীতে মাষ্টারকে নিয়ে গেল, যে বাড়ীর বর্ণনা হারান দিয়েছিল দুটোর মধ্যে যেন আকাশ জমিন ফারাক। মেয়েটি ডাকল—

ও কাঁদনী বেরিয়ে আয় তোকে কে ডাকছে।

বাড়ীর থেকে কাঁসার গলার আওয়াজ এল যেন—

কে ডাকছে?

জানি না, বেরিয়ে এসে তো দ্যাখ।

যত সব ঝামেলা, ভেতরে এসতে বল।

আপনি ভিতরে যান।

মেয়েটি চলে গেছে। ভিতরে ঢুকে মাষ্টার তো দেখেই অবাক, বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো। ঘর, উঠান পাকা বাঁধানো, বাইরে তুলসী মঞ্চ, যার কাছে আসা তার কোলে পাঁচ মাসের বাচ্চা, নিজের মেজাজে তাকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

মাষ্টারকেই দেখেই বলে ওঠে কাঁদনী—তুমি আবার কে? আমি তো ভাবলাম অন্য এসেছে। কি খবর বল দিখিনি বাবু, আমার শরীর খারাপ, আজ আর ভাল লাগেনি।

আমি মেদিনীপুর থেকে আসছি।

সেখান থেকে এত রাতে?

হারান পাঠাল,

ও এতদিনে মনে পড়ল।

মাষ্টার দেখছে কাঁদনীকে, তার শরীরে জেল্লা দিচ্ছে জরির শাড়ী, হাতে সোনার চুঁড়ি, কানে দুল, গলায় রূপার হার। হারান জিজ্ঞাসা করেছে তুমি কেমন আছ?

তা দেখতেই ত পাচ্ছ।

তা পাচ্ছি। কিন্তু ....

হুঁ, ভাত দিতে পারে না আবার ভাতার, তার উপর খবর লিতে পাঠিয়েছে। বলে দিবে কাঁদনী ভাল আছে।

আসলে ....

বলবে সে না আসলেও চলবে, অনা আছে, মন্টু, সইদুল, পাড়ার ওরা সব আছে, ওরা আমাকে কাজও দিয়েছে একটা।

কি কাজ?

ও যে গো—কি যেন বলে—ও যে গো রাঁধতে হয়, তা এমনি নাকি? বেতন দেয় হাজার টাকা, তারপর এটা, ওটা, সেটা, ওরা সব সময় আসে। পালা করে আমার ঘরে থেকে পাহারা দেয়। উপরি দেয়।

উপরি দেয়?

দিবেনি মানে, এমনি কি সব আসে, না দিলে আসতে দিব, ঝাঁটায় বিষ দাঁত ভেঙে দিব না।

তা তোমার বাচ্চা হল কবে?

এই পাঁচ মাসের হল। তা দাঁড়িয়েই কথা বলবে নাকি বসবে?

না ঠিক আছে।

আজ থাকবে তো নাকি? তাহলে আবার শইদুলকে আসতে বারন করে দিতে হবে, আজ তার পালা।

আর কথা বাড়ায়নি মাষ্টার, যাদের কথা বলছে, এসে গেলে বাইরের লোক সন্দেহ করে ঝামেলায় ফেলতে পারে, হারানের এবড়োখেবড়ো লিখা চিঠি আর দেয়নি কাঁদনীকে।

তোমার সব বাচ্চারা কোথায়?

ঐ তো সব ঘুমাচ্ছে,

একটু যদি দেখে যেতে পারতাম ....

যাওনা বাপু—ঐ ঘরে তো গাদাগাদি হয়ে ঘুমাচ্ছে।

ফট্ করে সুইজটা টিপে দেয় কাঁদনী। আলো জ্বলে ওঠে অন্ধকার ঘরে। মাষ্টার দেখে পাঁচটা বাচ্চা সুন্দর বিছানায় শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।

রাত্রি তখন প্রায় বারটা। একটা কুকুর ডাকছে ঘেউ ঘেউ করে। কে যেন তাকে থামতে বলছে—চুপ, চুপ চিনতে পারিস্‌নি।

মাষ্টার কাঁদনীকে বলে—যাইগো ভাবী, আবার ফিরতে হবে।

তবে কি থাকবে?

না তার দরকার নেই।

মেদিনীপুর ফিরে গ্যাছে মাষ্টার, হারানও ফিরেছে একটু আগে। মাষ্টার হারানকে সব বলেছে। হারানের চোখে জল গাল বেয়ে মাটিতে পড়ছে টপ্‌ টপ্‌। তারপর মাষ্টারকে তার বিবি বাচ্চার খবর দিয়েছে। তারা ভাল আছে। একটা চিঠিও দিয়েছে, লেখা আছে—এখন আসার দরকার নেই। আমরা ভাল আছি। কয়েকদিনের মধ্যে একবার মেদিনীপুর যাব, তোমার ঠিকানা জানতে পারিনি বলে যেতে পারি নি। ভালভাবে থেকো। তোমার ছেলে ইসমাইল বড় হয়েছে। সে তোমাকে দেখবে বলে প্রতিদিনই আড়ি করে। হারানবাবুর মুখে সব শুনেছি। আল্লার দোয়ায় ভাল আছ এটাই ভাল।

খুশিতে মাষ্টারের মনটা যেন টগ্‌বগ্‌ করছে। আর হারান—

আমি আর ফিরে যাবনি মাষ্টার।

কি করবে?

সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে লটা চিমটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, যে দিকে দু চোখ যায়।

আমাকে নিয়ে যাবে?

তুমি যাবে কেন? তোমার তো সব আছে। তোমার বিবি বাচ্চা আছে। তারা তোমার জন্য কত কাঁদল, আল্লার কাছে তোমার ভালর জন্য দোয়া চাইল। আসবে বলেছে। আর আমার দেখ তো!

কিন্তু যাবে কোথায়?

শুনেছি এখান থেকে একশ কিলোমিটার দূরে বর্ধমান পেরিয়ে কি একটা আশ্রম আছে, সেখানে সবাই যায়, কেউ কেউ ফিরে আসে, কেউ কেউ থেকে যায়, আমি সেখানে চলে যাব। সেখানে মুসলমান, হিন্দু সবাই একসাথে থাকে।

সেখানে যেতে তো টাকা লাগবে?

সেই টাই তো সমস্যা।

একটা কথা বলব হারান?

বলো, মাষ্টার—তুমিই তো এখন আমার সব।

আমি যদি তোমাকে দিয়ে আসি?

তুমি টাকা পাবে কোথায়?

তোমার হাতে যে খামটায় তোমার ভাবি চিঠি দিয়েছিল, তার মধ্যে হাজার খানেক টাকাও দিয়েছিল।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। সেই টাকাটার কিছুটা খরচ হলে তো এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

আমি একটা কথা বলব?

বল না!

তোমাকে যেতে হবে না, আমি একাই চলে যাব। কেননা তোমার বিবি, বাচ্চা আসবে, তারা দেখতে না পেয়ে ফিরে গেলে খুব একটা ভাল হবে না।

কথাটা অবশ্য ঠিকই। তাহলে তুমি শ পাঁচেক টাকা নাও।

না তা আমি পারব না।

তাহলে ধরে নিতে হবে, তুমি আমাকে বন্ধু ভাবছ না।

বেশ তাহলে দাও, তবে একশ টাকা।

যা দিচ্ছি নাও।

মাষ্টার হারানের হাতে পাঁচশ টাকা দেয়।

ঘুরতে ঘুরতে হারান পৌঁছাল এক আশ্রমে, তবে বর্ধমানে নয়, নাড়ুয়া বলে একটি গ্রামে। মেদিনীপুর থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ কিমি দূরে। সেখানে নাম সংকীর্তন হয় সকালে সন্ধ্যায়। হারান সেখানে বসে থাকে। ভোগ দিলে খায়। আশ্রমের দুয়ারে রাত্রে ঘুমায়। আশ্রমবাসীরা হারানকে দেখে প্রতিদিন, একদিন সমস্ত ঘটনা তার কাছে শুনে, আশ্রমেই থেকে যাওয়ার কথা বলে। মাষ্টারের দেওয়া পাঁচশো টাকা হারান আশ্রমের মহারাজকে দিয়ে দেয়। সেই থেকে হারান আশ্রমের বাসীন্দা। সেখানে নিরামিষ খায় প্রতিদিন, কাঁদনের জ্বালা পোয়াতে হয় নি। লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াতেও হয় না, মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়—মাষ্টার বলেছিল "তোমার বাচ্চা পাঁচটা বেশ বড় হয়েছে"—সেই বাচ্চাগুলোর কথা।

হারান বাগদীর অভ্যাস যেন তাকে ছাড়ছেনা—মুখ তিতাবিতা হয়ে যাচ্ছে। সে ঘুমাতে ঘুমাতে, কখনও খেতে বসে স্বপ্ন দ্যাখে, মনে মনে ভাবে গেঁড়ি গুগলি, হাঁস মাংস, মুরগীর ছাল, নদীর চুনোপুঁটি অথবা গোপন আস্তানায় সপ্তাহে একদিন মাংস, তিনদিন ডিম, তিনদিন মাছের কথা। আর তার ঔরসজাত পাঁচ বাচ্চার কথা, তারা তো হারানেরই। কাঁদনীর স্বপ্ন দেখে না, তার কথা ভাবেও না, আর ভাবে না—মাষ্টারের দেখা পাঁচ মাসের বাচ্চাটার কথা যে কাঁদনীর কোলে শুয়ে দুধ খাচ্ছিল। সে তো হারানের নয়।

অনিন্দিতা

মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে নেড়াদেউল হাইস্কুলে। সবাই লিখছে মনোযোগ দিয়ে। অথচ অনিন্দিতা কাঁদছে। পাছে কেউ দেখে ফেলে, মুখ নিচু করে তার হাতের রুমাল দিয়ে বারবার মুছে নিচ্ছে তার চোখের জল, যে রুমালটা তার মা ব্রততী তৈরী করে দিয়েছিল। অনিন্দিতা তখন অষ্টম শ্রেণীতে। অষ্টম শ্রেণীতে যখন অর্ধবার্ষীক পরীক্ষা চলছে, অনিন্দিতা বলেছিল— দেখ মা আমার হাতটা ভীষণ ঘেমে যায়, লিখতে পারি না, খাতাও ভিজে যায়।

সেলাই-এর বাক্স থেকে বের করে এনে—এই নে এটা পরীক্ষার সময় তোর পেনসিল বাক্সে রাখবি। ঘাম দিলে মুছে নিবি।

সেই থেকে অনিন্দিতার কাছে সেই রুমাল এখনও রয়েছে।

পরীক্ষার সময় হলেই নিয়ে যায়। অন্যসময় রেখে দেয় যত্ন করে।

সুপর্না দেখেছিল তাকে কেননা পাশাপাশি তাদের সীট পড়েছিল।

জিজ্ঞাসা করেছিল—তুই কাঁদছিস্ কেন?

কই না তো,

আমি কি ভুল দেখছি?

হয়তো তাই।

জীবনে সবাই সবার জন্য থাকে না, মনটা যদি শক্ত না করিস্ বাঁচবি কি করে।

অনিন্দিতা দেখেছিল সুপর্নাকে, শুনেছিল তার বলা কথাগুলি। সে তার বান্ধবী কিন্তু তার মুখ থেকে বেরুনো কথাকটিও যেন তার মায়েরই মত।

পরীক্ষা শেষের ঘন্টা বাজতে সুপর্না হল থেকে বেরিয়ে তার মা বাবাকে সব বলেছিল, পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল অনিন্দিতার সাথে।

সুপর্নার মা তাকে কন্যা স্নেহে সান্তনা দিয়ে বলেছিল—আমিও চিরকাল থাকব না, কেউই চিরকাল থাকে না, বাস্তবকে মেনে নিয়ে মন খারাপ না করে তোমার বিষয়ে মন দাও। নইলে তুমি হারিয়ে যাবে মা।

অনিন্দিতা দেখেছিল সুপর্নার মাকে, যেন মিলিয়ে নিচ্ছিল তার মুখের সাথে ব্রততীর মুখ, তারপর প্রণাম করে বলেছিল—মাসীমা কাল আস্‌বেন তো?

হ্যাঁ মা আসব।

আমার সাথে দেখা করবেন তো?

করব মা।

চলে গেছল অনিন্দিতা তার বাবার সাথে। তার বাড়ী রাজগঞ্জ। সুপর্ণা তার মা, বাবা মোটর সাইকেলে করে ফিরে এসেছিল তাদের বাড়ী ঝালুর।

পরের দিন পরীক্ষার আগে আবার দেখা হয়েছিল অনিন্দিতার সাথে।

অনিন্দিতা যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। কত বয়স হবে ব্রততীর বড়জোর প্রথম ত্রিশের কোঠায়। একটু কম বয়সেই বিয়ে হয়েছিল ব্রততীর। রমেন রায় তখন চাকরী পেয়েছে প্রাথমিক স্কুলে। রমেনবাবুর মা মারা গেছেন রমেনবাবু তখন অষ্টম শ্রেণীতে। তারপর এখন চাকরী। রমেনবাবুর বাবা আর বিয়ে করেন নি কেননা কেমন মেয়ে আসবে কি ভাবে তার একমাত্র ছেলেকে দেখবে এইসব আশঙ্কায় থেকে অনেকের অনুরোধ সযত্নে এড়িয়ে ছেলেকে মানুষ করেছেন। হঠাৎ তার অসুখ হল, ছেলের বৌ দেখার জন্য ছট্‌ফট্ করতে শুরু করলেন। ব্রততীও মাধ্যমিকে পাশ মেয়ে সুন্দরী, গান জানে, বাবার তিন কন্যার সবার ছোট। পছন্দ করে বিয়ের কাজ সারলেন রমেনবাবু। তারপরেও রমেনবাবুর বাবা বেঁচেছিলেন দু বৎসর, সেবায় ভরিয়ে দিয়েছে ব্রততী, আশীর্বাদ করেছেন শ্বশুর প্রাণ ভরে।

তারপর ব্রততীর মেয়ে হয়েছে সে অনিন্দিতা। তাকে নিয়ে তার সুখের সংসার, স্বপ্নের সংসার, সেই সংসারে থেকে জাল বুনে চলে ব্রততী। আর রমেনবাবুর ভালবাসায় সে যেন স্বর্গের কাছাকাছি।

সেই ব্রততী অসুস্থ হয়ে পড়ল, তার জ্বর ছাড়ছেনা কোনভাবেই। চন্দ্রোকোনা হাসপাতালে থাকল কয়েকদিন, ওষুধ খায় জ্বর কমে, ওষুধ বন্ধ জ্বর বাড়ে, কোন কোনদিন ওষুধ খেয়েও জ্বর কমে না। সেখান থেকে ঘাটাল হাসপাতাল। একই অবস্থা। তারপর মেদিনীপুর সদর হাতপাতাল কোন উন্নতি নেই। ফিরে এসেছিল বাড়ীতে।

রমেন বাবুর বেতন আর কত, মেয়ের পড়াশুনা, টিউশন ফি পোষাক পরিচ্ছদ, রোগ জ্বালা, খাবার, তার উপর ব্রততীর চিকিৎসার খরচ, টান পড়ছে ভাঁড়ারে, চাষ আছে বিঘে পাঁচেক, আয় কিছু হয়, চাপ পড়ে সেদিকেও ভাল নজর দিতে পারছেন না। চিন্তায় কপালের রেখা দিন দিন স্পষ্ট হচ্ছে, চুলে দু-চারটা করে পাকবরণ আসছে। এত ধোপদুরস্ত মানুষ অথচ পোষাকের দিকে নজর নেই খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর নেই, স্ত্রীঅন্ত প্রাণ, কিন্তু অর্থের টান যেন ভালবাসাতেও টান দিয়েছে। মেজাজে আসছে খিট্‌খিটেমি। ভাবতে থাকেন কি যে হবে, ঈশ্বর যে কি লিখে রেখেছেন কপালে!

ব্রততী রমেনবাবুর মুখ দেখে বুঝতে পারে সব কিছু, মাঝে মাঝে বলে—আমার জ্বর আর সারবে না, শুধু শুধু টাকা পয়সা নষ্ট করছ, আর মেয়েকেও অবহেলা করছ।

কিন্তু.........

কোন কিন্তু নয়, আর ডাক্তার দেখাতে হবে না, দেখছ না মেয়েটাও অযত্নে কেমন হয়ে যাচ্ছে।

বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখাতো সম্ভব নয়।

সবই ঠিক কিন্তু আমি তো দেখছি তোমার সব শেষ, টাকা আর পাবে কোথায়।

আমি ব্যাঙ্কে একটা লোনের ব্যবস্থা করেছি। দু পাঁচ দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে।

এদিকে অনিন্দিতা তার স্কুলে বন্ধুবান্ধবদের এটা ওটা আলোচনায় শুনেছে মৌড়িগ্রামের কথা, স্কুল থেকে ফিরে এসে বাবাকে বলেছে—বাবা সবাই বলছিল মাকে মৌড়ীগ্রাম নিয়ে গেলে সেরে যাবে, নিয়ে চলনা বাবা।

নিয়ে যাবরে, আমিও তো কয়েক দিন তাই ভাবছি।

লোনটা উঠতে দে।

তুমি লোন নিচ্ছ বাবা?

কি করব বল, সব টাকাতো শেষ। মা সুস্থ হলে ....

মা এর কি হয়েছে বাবা?

কেউ তো রোগ ধরতেই পারছে না।

তাহলে কি হবে!

কি জানি, কি যে শেষ পর্যন্ত হবে।

পাঁচদিন যেন আর সইছে না। জ্বর বাড়ছে তো বাড়ছেই, তার উপর দিন দিন কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে ব্রততী, কিছুই খেতে পারছে না, সবসময় বমি বমি ভাব। মৌড়িগ্রাম নিয়ে যাবে সে অবস্থাও নেই।

টাকা পেয়েছেন রমেন বাবু—কুড়ি হাজার টাকা, ব্রততীকে বলেছেন। টাকাটা পেলাম, এবার তোমাকে কালই মৌড়িগ্রাম নিয়ে যাব।

মিছি মিছি এসব করছ? আমি জানি আমার এ রোগ কোনদিন সারবে না।

এসব কথা বলোনা ব্রততী। তোমাকে বাঁচতে হবে, তোমার মেয়ের জন্য।

কিন্তু ....

তুমি সুস্থ হয়ে যাবে ব্রততী।

রাত্রিতে শুরু হয়েছে পেটের যন্ত্রণা, বার বার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে ব্রততী।

সকালেই মৌড়িগ্রাম না গিয়ে ব্রততীকে নিয়ে মেদিনীপুরে ডাঃ সাহার কাছে দেখাতে যান রমেন বাবু। তিনি ভালভাবে দেখে বলেন—

আপনার স্ত্রীর কয়েকটা পরীক্ষা এক্ষুণি করতে হবে। ওনাকে বাইরে নিয়ে যান, আর আপনি একটু শুনুন।

একান্তে রমেনবাবুকে ডেকে ডাঃ সাহা বলেন—

আমার দেখে যা মনে হচ্ছে আপনার স্ত্রীর Blood Cancer, report গুলো আগামী কাল অবশ্যই নিয়ে আসবেন। ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন ডাঃ সাহা। সমস্ত পরীক্ষা করতে দিয়ে ব্রততীকে নিয়ে এক আকাশ হতাশায় ফিরে আসেন রমেনবাবু।

পরীক্ষায় ধরা পড়েছে Blood Cancer এবং খুব খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে অবস্থা, কোন ওষুধ কাজ করছে না।

অনিন্দিতার সামনে পরীক্ষা কিন্তু মন নেই পড়াশুনায়, মায়ের কাছে বসে থাকে আর যত দুশ্চিন্তা মাথায় কিলবিল করে। অনিন্দিতার খাওয়া দাওয়া উঠে গেছে।

ব্রততী দেখছে অনিন্দিতাকে কেবল কেঁদেই চলেছে সে, মেয়েকে বলে কাঁদছিস্ কেন মা।

আমাদের কি হবে মা।

তোর বাবাতো আছে। তোর বাবার একটু যত্ন নিবি কেমন, বাবার কথা শুনবি, দেখিস কোনদিন যেন সে আঘাত না পায়। ভালভাবে পড়াশুনা করবি।

মা তুমি কি সব বলছ?

নারে আমি ঠিকই বলছি, আমার যে ডাক এসেছে।

রমেনবাবু এতদিন পর্যন্ত আশায় বুক বেঁধেছিলেন, কিন্তু সব জানার পর যেন পাগল হয়ে গেছেন, তিনি আর তেমন কথা বলছেন না কারও সঙ্গে, নিয়মিত স্কুল যাচ্ছেন না।

কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন আর পায়চারি করছেন ঘরময়।

মাঝে মাঝে ব্রততীর কাছে গিয়ে তার পাশে বসে মাথায় হাত রেখে বলছেন—ব্রততী খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না। তুমি সুস্থ হয়ে যাবে।

তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন? আমি জানি আমার কি হয়েছে।

তুমি ভুল জেনেছ।

আমি যে সব শুনেছি।

কি শুনেছ?

আমার ক্যানসার হয়েছে।

এসব বাজে কথা তোমাকে কে বলল?

ডাক্তারবাবু তোমার সাথে যখন কথা বলছিলেন তখন শুনেছি।

ওঃ ঈশ্বর।

তুমি তোমার হাত দুটো আমার মাথায় রাখবে।

এই তো।

রমেনবাবুর দুটি হাতের উপর ব্রততী হাত রেখে বলে অনিন্দিতা রইল, ওকে দেখ, যেন কখনও কোন কষ্ট না পায়।

জানি ব্রততী।

ও যতদূর পড়বে ওকে পড়িও।

পড়াব ব্রততী, পড়াব।

ওতো আমাদের একমাত্র মেয়ে, ওর যখন বিয়ে দেবে এমন ছেলের সাথে দেবে সে যেন ঠিক তোমার মত হয়।

কেন ব্রততী, এভাবে বলছ কেন?

কথা দাও।

কথা দিলাম ব্রততী।

হাত সরিয়ে নেন রমেনবাবু, তার চোখে জলে ভরে যাচ্ছে, কিন্তু কাঁদতে পারছেন না শব্দ করে।

দুতিন দিন পরে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। অনিন্দিতা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে সন্ধ্যা দেখিয়েছে তুলসী তলায়, ইদানিং সন্ধ্যার মাঙ্গলিক কাজটা অনিন্দিতাই করে। সেই সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোর শিখায় নিজের হাত উত্তপ্ত করে ব্রততীর মুখে মাথায় রাখে সেই হাত, ব্রততী তার হাতটা ধরে নিয়ে বার বার চুমু খায়, বলে—তুই বসনা আমার কাছে।

এইতো মা বসেছি।

আয় তোকে একটু আদর করি।

ব্রততী যেন কেমন হয়ে গেছে, কি করে নিজেও জানে না অথবা পিছনের স্মৃতিগুলো হয়তো তার মনে ভীড় করে, অনিন্দিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুম পাড়ানী গান গায়।

অনিন্দিতা ....

বলো!

এবার আমি যাবরে।

তুমি যেও না মা।

আমার যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে মা।

কোথায়?

জানি না, মনে হচ্ছে সব জায়গায়, তোর বাবা কোথায়?

এইতো তোমার পাশে।

ও পাশে আছো? তুমি কথা বলছ না কেন?

তোমার মেয়ে বলছে তো।

তোমরা দুজনেই কথা বলো।

ব্রততী!

অনেক রাত্রি হয়ে গেছে তাই না।

না তো, সবে তো সন্ধ্যে হল।

অনিন্দিতা তোর খুব খিদে পেয়েছে তাই না।

না মা।

শুনছো অনিন্দিতাকে খেতে দাওনা, আমি যে উঠতে পারছি না।

তুমি শান্ত হও, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

সেই ভাল অনিন্দিতা তোর হাতটা দেতো মা। আমার হাত তো তোমার হাতেই মা। কই নাতো, আমি যে কিছুই দেখতে পারছি না।

শুনছো—লাইটগুলো জেলে দাও না।

সব জ্বলছে ব্রততী।

ও তাই বলো, অনিন্দিতা।

বলনা।

ভালভাবে থাকিস্, বাবাকে দেখিস্।

তারপর মুখের যেন একটা বিকৃতি এসে যায় ব্রততীর, একটু পরেই স্তব্ধ হয়ে যায় সব কিছু। অনিন্দিতার হাত তখনও শক্ত করে ধরা আছে ব্রততীর হাতে। রমেনবাবু দৌড়ে বেরিয়ে গেছেন পাশের ডাক্তারের কাছে। তিনি এসে দেখে বলেন—

দুঃখিত রমেনবাবু আপনার স্ত্রী আর নেই।

সঙ্গে সঙ্গে রটে যায় পাড়ায়, গ্রামে। বাড়ীতে ভীড় জমে গেছে ঢের, সবারই সমবেদনার ভাষায় বাড়ীতে যেন একটা ভীষণ শোকের পরিবেশ।

অনিন্দিতা একটু আগেও কাঁদছিল, আর কাঁদছে না। একটা হাত তার মায়ের হাতে, একটা হাত যে অবচেতন মন নিয়ে মায়ের চোখে, মুখে বুলিয়ে যাচ্ছে অনিন্দিতা।

একটু আগেও শেষবারের মত চুমুতে ভরিয়ে দিয়েছে ব্রততী তার মেয়ের ঠোঁটে, চোখে, আর কোনদিন চুমু খাবে না ব্রততী। আর কোনদিন ভাত বেড়ে ঘুম থেকে তুলতে আসবে না অনিন্দিতাকে তার মা। মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কেউ বলবে না—তোর চুলগুলো তোর বাবার মত ঘন আর মোটা, স্কুল বেরনোর সময় অন্ধ সংস্কার নিয়ে আর কেউ পিছে ডাকবে না।

অনিন্দিতা যেন পাথর হয়ে গেছে।

রমেনবাবু হাতটা সরিয়ে দেন ব্রততীর হাত থেকে। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন রমেনবাবু।

হারিয়ে গেল রমেনবাবুর প্রিয়তমা ব্রততী, হারিয়ে গেল স্নেহময়ী মা অনিন্দিতার এখন হয়তো কেবল বাঁধানো ফ্রেমে টাঙানো থাকবে দেওয়ালে একজনের মৃতা স্ত্রী হয়ে, একজনের মৃতা মা হয়ে।

রমেন রায় আর তার একমাত্র মেয়ে ব্রততী রায় কেউ কাউকে যেন ছেড়ে থাকতে পারে না, এক মুহূর্তের অদেখায় যেন তাদের পৃথিবী ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। রাত্রিতে

তাদের কথা যেন শেষ হয় না, আদর শেষ হয় না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই অনিন্দিতা বাবার জন্য চা এনে বিছানায় দেয়, নিজেও খায়, তারপর প্রাতঃকালিন কাজ সেরে মেয়েকে পড়ায় তার মত করে, সামনে পরীক্ষা অনেক ঝড় গেছে মেয়েটার উপর।

পরীক্ষা শেষ হয়েছে অনিন্দিতার—এখন সে নবম শ্রেণীতে ভাল ফল করেছে। ভীষণ খুশি রমেন বাবু, খুশি অনিন্দিতা বাবার মুখে হাসি দেখে, মায়ের কথা রাখতে পারছে এইসব ভেবে।

একদিন রমেনবাবুর স্কুলে সহশিক্ষক রথিণবাবু বলেন—রমেনদা আপনার বয়স আর কত হবে, তাছাড়া মেয়ের পড়াশুনা, খাওয়া দাওয়া, আপনার শেষ জীবন ....

যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি।

কি আর বলবে ভাই।

যদি অভয় দেন ....

বলোনা শুনি, এমন আমতা আমতা কেন ?

একটি মেয়ে আছে—বয়স হবে পঁচিশ ছাব্বিশ, খুব গরীব। বাবা মা আছেন, একটি ভাই আছে। লেখাপড়া উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে আর পড়তে পারে নি। ভাইটি বি. এস. সি. পাশ করে চাকরীর চেষ্টা করছে আর কিছু ছেলে পড়াচ্ছে, তাই দিয়ে তাদের সংসার চলে।

কি বলবে বল দিখিনি বাবু—এত ধ্যানাই প্যানাই ভাল লাগে না বাড়ী যেতে হবে, মেয়েটা স্কুল থেকে ফিরে দেখতে না পেলে হাত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে। আমার সময় নেই ?

তাকে একবার দেখবেন ?

না না আর দেখায় কাজ নেই।

না বলছিলাম কি, আপনি মেয়ের সাথে আলোচনা করে, ভেবে আমাকে বলবেন তারপর না হয় ....

রমেনবাবু হ্যাঁ বা না—আর কিছু না বলে বাড়ী ফিরে গিয়ে যা ভেবেছিলেন তাই দেখলেন।

মেয়েকে আদর করে, বুঝিয়ে বিকেলের খাবার খাইয়ে একটু ঘুমাতে বলেন, যেমন প্রতিদিন বলেন তেমনিই, কেননা ঐ ঘুমটুকু অনিন্দিতাকে রাত্রি জেগে পড়তে সাহায্য করে।

তার মধ্যে রান্নাটুকু সেরে নেন রমেনবাবু।

প্রতিদিন ঘুম থেকে তুলে পড়তে বসান মেয়েকে, রাত্রি দশটা বাজলে দুজনে খেয়ে দেয়ে আবার পড়াশুনা, রাত্রি একটা দেড়টা বাজলে রমেনবাবু মেয়ের বইপত্র গুছিয়ে বিছানা ঝেড়ে তারপর আলো নেভান। এরও পরে সারাদিনের সঞ্চিত কথা সারতে সারতে রাত্রি দুটো আড়াইটা বাজে। ঘুমিয়ে যায় অনিন্দিতা, ঘুমিয়ে যান রমেনবাবু।

সেদিন রমেনবাবুর চোখে ঘুম নেই, অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু রথিনবাবুর কথাগুলি চেপে গেছেন মেয়ের কাছে। তাছাড়া বলবেনই বা কি করে, এর তো কোন বাস্তবতা নেই, কিন্তু ছট্‌ফট্ করে মন। হাসিও আসে, তারপর সিদ্ধান্ত নেয় সে বলবে।

ডাক দেয় অনু কিরে ঘুমিয়ে গেলি, এই অনু, অনু।

কি হল আবার, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

একটা কথা তোকে বলাই হয়নি।

কি কথা আবার বলবে, কটা বাজছে, কাল সকালেই টিউশন, সেখানে স্যার পরীক্ষা নেবে, আজ ঘুমিয়ে পড়।

আমার যে ঘুম ধরছে না?

মাথার চুল টেনে দেব?

না না তার দরকার হবেনা।

তাহলে, ঘুম ধরছে না কেন?

ঐ যে কয়েকটা কথা বলা হয়নি তাই।

ও, তুমি না ....

বলব?

না বললে তো ঘুমাবে না, আমার কাল পরীক্ষা ....

তবে থাক।

না থাকবে কেন, সংক্ষেপে বলে দাও।

বুঝলি.........

কি?

স্কুলে সেই তোর রথিনবাবু ....

কি হয়েছে রথিন বাবুর?

না কিছু হয়নি—

কি হল হাসছ কেন?

হাসি পাচ্ছে তোর রথিনবাবুর কথা শুনে।

কি বলেছে?

বলে কিনা একটি গরীব বাড়ীর মেয়ে আছে যদি আমি তাকে বিয়ে করি।

আর কি বলেছে?

সে তোর আমার দেখাশুনা করবে, তোকে মেয়ের মতই যত্ন করবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনিন্দিতা তারপর হঠাৎ যেন বড় হয়ে যাওয়া মেয়ের মত বলে এবার ঘুমাও।

রমেনবাবু বুঝতে পারেন মেয়ে কষ্ট পেয়েছে, মনে মনে ভাবেন না বললেই ভাল হত, কিন্তু অভ্যাস তো যাওয়ার নয়, আগে সবকিছু ব্রততীকে বলত এখন ব্রততী নেই, অনিন্দিতাকেই সব কিছু বলে, না বললে যে ঘুম আসে না।

তার মনে পড়ে ব্রততীর কথা, অনিন্দিতা তখন দশ বৎসরের, ব্রততীর এক মাসতুতো বোন এসেছে। রাত্রে রয়ে গেছে সেদিন। শুয়েছে ব্রতীতর কাছে। রমেনবাবু পাশের ঘরে। রাত্রির অভ্যেস যায় কোথায়। বার বার দরজা খুলছেন আর বাথরুম যাচ্ছেন। রাত্রি তখন দুটো, ব্রততীর ঘুম ভাঙতে শুনতে পায় রমেনবাবু দরজা খুলে বাইরে যাচ্ছেন, পনের মিনিট পরে আবার যাচ্ছেন। বুঝতে পারে ব্রততী। মাসতুতো বোন সাগরীকে ঘুম থেকে তুলে বলে যা তো তোর জামাইদাকে ডেকে আনবি।

কেনরে—একা একা তোর ভাল লাগছে না বুঝি।

আমার নয়, তোর জামাইদার।

সে কিরে?

আর বলিসনা—সারাদিনের ঘটনা সমস্ত কিছু না বললে ওনার ঘুমই আসে না।

তুই না থাকলে কি করেন,

না থাকার উপায় আছে? কি মানুষ যে জানি না বাবা। শুধু গল্প করার জন্য ঘুম আসে না, নাকি অন্য কিছু।

আরে না না—তুই যা ভাবছিস্ তা নয়।

অগত্যা সাগরী ডেকে দেয়—ও জামাইবাবু রাত জেগে কি হবে এ ঘরে আসুন, আজ দুজনে মিলে আপনার গল্প,শুনব।

না না ঠিক আছে।

কিছু ঠিক নেই, বাথরুম গিয়ে গিয়ে রোগ ধরে যাবে।

আরে না না, সব ঠিক আছে।

দিদি ডাকছে।

এত রাত্রে আবার ডাক কেন?

সে আপনিই জানেন।

আমার খুব ঘুম পাচ্ছে, তুমি বলো গিয়ে সব ঠিক আছে।

আপনি আসবেন নাকি আপনার ঘরে আমি ঢুকব?

এতো মহা জ্বালা, কটা বাজছে জানো?

তার থেকেও বড় কথা কতবার বাথরুম গেছেন ভাবুন?

কি হল আসবেন না কি ঘর ঢুকবো?

ওরে বাবা, তোমার এসে কাজ নেই, চলো যাচ্ছি।

তিনজন আর ছোট্ট অনিন্দিতা সেই রাত্রে সবাই এক বিছানায়, আর সমস্ত রাত্রি হাসির ফোয়ারা। সেই ভোরের দিকে ঘুম এসেছিল রমেনবাবুর।

অনিন্দিতা এখন তার ঘুমের ওষুধ, আর মেয়েটাও হয়েছে তেমনই, বাবার গল্প না শুনলে, হাতে, পিঠে একটু শুড়শুড়ি না দিলে তার ঘুম আসে না।

আজ অনিন্দিতার যেন অন্য সুর। সে ঘুমাইনি সমস্ত রাত্রি। রমেনবাবুও ঘুমাতে পারেন নি অনুশোচনায়।

দু তিন দিন যেন মনমরা হয়ে রয়েছে অনিন্দিতা।

কিরে তোর কি হয়েছে, তেমন কথা বলছিস্ না।

নাতো, কিছু তো হয়নি।

অনু তুই আমাকে কি লুকাচ্ছিস্ বলতো।

আমার যে কিছু লুকানোর নেই বাবা।

তাহলে, তুই এত গম্ভীর হয়ে রয়েছিস্ কেন?

একটা কথা বলব বাবা?

বলনা, তুই ছাড়া আর কথা বলার আমার কে আছে।

তুমি মেয়ের কথা বলছিলে না?

তো কি হয়েছে, রথিন বলছিল তাই বললাম।

আমাকে নিয়ে যাবে?

কোথায়?

সেই মেয়েটির বাড়ী।

তুই কি পাগল হয়ে গেছিস্।

না।

এটা কি বাস্তবে সম্ভব?

কেন নয়? আমাদের ক্লাসের এক বন্ধুর বাবাও তো দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছেন।

তো কি হয়েছে?

তারা তো বেশ ভালই আছে, বন্ধু তাই বলছিল।

কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়?

সে তোকে বোঝাতে পারব না।

বোঝাতে তোমাকে হবে না, তুমি রথিনবাবুকে বলে দাও আমিও যাব।

অনু তুই ভুল করছিস্, এতে ভাল হয় না।

কেন? বন্ধুর তো হয়েছে।

এক আধটা হতে পারে, বেশীর ভাগই অন্যরকম হয়।

বেশ হবে?

এর তো উত্তর আমার জানা নেই।

তোমাকে জানতে হবে না তাছাড়া তুমি মাকে তো কথা দিয়েছিলে তোমার মেয়ের ভালর জন্য ভাববে।

এটা ভাল নয়, আর এমন কথা আমি দিই নি।

আমি যদি মনে করি ভাল তাহলেও যাবে না?

বেশ, চল তাহলে।

তখন অনিন্দিতার নবম শ্রেণীর অর্ধবাৎসরিক পরীক্ষাও হয়ে গেছে, ফল বেরোয়নি, দুজনে গিয়ে দেখে এসেছে মেয়েটিকে, সাথে রথিনবাবু। অনিন্দিতার পছন্দ হয়েছে শুভ্রাকে, হ্যাঁ বলে দিয়েছে সে।

একদিন রেজিস্ট্রী করে ঘরে এনেছে শুভ্রাকে।

শুভ্রা অনিন্দিতাকে নিজের মেয়ের মত যত্ন করে, যত্ন নেয় রমেনবাবুর প্রতিও।

ব্রততীর স্মৃতি ফিকে হচ্ছে ধীরে ধীরে—রমেনবাবু অনিন্দিতার মন থেকে। শুভ্রা মন জয় করছে অনিন্দিতার, সংসারের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। দেখে খুশি রমেন বাবু। শুভ্রর মা, বাবা, দাদা। সবাই আসছে মাঝে মাঝে। রমেনবাবুও যেন স্ত্রী-অন্ত প্রাণ। আর অনিন্দিতার, কষ্ট হচ্ছে ঘুমাতে। কিন্তু চেষ্টা করছে আস্তে আস্তে মানিয়ে নেওয়ার।

নবম শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষা তখনও দু মাস বাকী, একদিন অনিন্দিতা স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখে তার নতুন মা বাথরুমে ঢুকে অনবরত বমি করছে, বাইরে আসছে আবার যাচ্ছে। বাবা তখনও ফেরেনি, সেদিন বেতন তোলার দিন ব্যাঙ্কে যাবে, সেখান থেকে বাজার যাবে বেশ সন্ধ্যে হয়ে যাবে। অনিন্দিতা মাকে কিছু না বলে ডাক্তার ডেকে এনেছে, ডাক্তার বাবু দেখে বলেছেন শুভ্রা মা হতে চলেছে। কিছুদিন বিশ্রামে থাকতে হবে। সঙ্গে কিছু ওষুধ এনেছিলেন, সেই ওষুধ দিয়ে বাকী ওষুধ আনার কথা বলে চলে গেছেন তার চেম্বারে।

রমেনবাবু সব কাজ সেরে ফিরেছেন সন্ধ্যের পরে, দেখেছেন শুভ্রা শুয়ে আছে, পাশে অনিন্দিতা—তাকে যতটুকু সম্ভব সেবা করছে।

বাবাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে অনিন্দিতা বলে—

বাবা ডাক্তারবাবুকে ডেকেছিলাম, দেখে গেছেন, তোমাকে এক্ষুনি যেতে বলে গেছেন।

কেন কি হয়েছে?

তার কাছেই জানতে পারবে।

তোকে বলেননি ?

না আমাকে বলেননি, তবে মাকে বলেছেন।

শুভ্রাকে দেখেই রমেনবাবু চলে গেছেন ডাক্তার বাবুর কাছে।

মাস্টারদা এসেছেন ?

হ্যাঁ, কি ব্যাপার বলুন।

আপনার মেয়ে ডাকতে এসেছিল, গিয়ে দেখলাম আপনার স্ত্রী মা হতে চলেছেন, আর এই সময় বমি হয়। ওষুধ কিছু দিয়ে এসেছি, বাকীটা নিয়ে যান।

আপনি নিশ্চিন্ত ?

প্রায়। তেমন মনে করলে পরীক্ষা করে নেবেন, আমি লিখে দিচ্ছি।

রমেনবাবু একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে এসেছেন বাড়ী।

কি করে এটা সম্ভব, শুভ্রাকে তো প্রতি মাসে মাসে গর্ভনিরোধক ওষুধ এনে দেওয়া হচ্ছে।

শুভ্রাকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি ওষুধ খাওনি ?

না।

কেন ?

এমনি।

দেখ শুভ্রা, অনিন্দিতা বড় হয়েছে, সে কি ভাববে।

ভাববার কি আছে।

না, তা নয়। আমি বলি কি এটা নষ্ট করে দাও।

কেন ? আমার কি মা হওয়ার অধিকার নেই, নাকি হওয়া চলবেনা। হঠাৎ যেন বদলে গেছে শুভ্রা।

নেই কে বলছে, তুমি তো অনিন্দিতার মা।

সে তো তোমার আগের পক্ষের। দুধের স্বাদ তো আর ঘোলে মেটে না।

কি বলছ শুভ্রা।

ঠিকই বলছি, জেনে রাখো, আমি মা হতে চাই।

তাহলে তোমাকে যে প্রতি মাসে ওষুধ এনে দিই তা তুমি ইচ্ছে করে খাওনি ?

ওসব বুঝিনা—আমি বাচ্চা নষ্ট করব না, এই আমার শেষ কথা।

রমেন বাবু সুখের সংসারে ঝড় উঠছে আস্তে আস্তে।

ব্রততী বলেছিল—"অনিন্দিতা রইল, ওকে দেখো, যেন কখনও আঘাত না পায়।" শেষ কথাগুলি যেন শুনতে পাচ্ছেন রমেন বাবু, তার বুকে বসে শুভ্রা যেন পাথর ভাঙছে একটি একটি করে, তার থেকে প্ররোচিত যন্ত্রনা ছড়িয়ে পড়ছে স্নায়ুতে স্নায়ুতে। কি বলবে

অনিন্দিতাকে, কি জবাব দেবে ব্রততীকে। ঘুম যেন আসতে চাইছেন না রমেন বাবুর। বমি করার ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন শুভ্রা, মাঝে মাঝে টর্চের আলো জ্বেলে দেখছেন শুভ্রাকে, তার মনে হচ্ছে—কোন এক কৈকেয়ী লোভ আর হিংসার প্রতিমূর্তী হয়ে সবাইকে জব্দ করার তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্ত হয়ে।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে রথিনবাবুকে সব বলেছেন রমেনবাবু। রথিনবাবু কেবল নিরুত্তর থেকেছে।

রাত্রি এলে শেষ বারের মত জিজ্ঞাসা করে—তুমি কি তোমার সিদ্ধান্ত বদলাতে পারো না?

না।

তুমি তো বলেছিলে—অনিন্দিতা তোমার মেয়ে, তাকে নিয়েই বেঁচে থাকবে সারা জীবন, কোনদিন কোন ভুল করেও বাচ্চা নেবে না। অনিন্দিতা যে তার মা কে হারিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছে নিজের মা ভেবে, তারও দাম দেবে না?

আমি কোন কথা শুনতে নারাজ। তাছাড়া সবাই বলছে, এভাবে সতীনের মেয়েকে আঁকড়ে থেকে সারা জীবন কাটানোর অর্থ নিজেকে শেষ করা। আমিও তা চাইনা।

তুমি এ ঘরে এসেছিলে অনিন্দিতার অনুমতিতে।

তাতে কি হয়েছে।

অনিন্দিতা না বললে তুমি রমেন রায়ের স্ত্রী হতে পারতে না।

তাহলে তোমার মত ছিল না।

না।

করলে কেন?

অনিচ্ছায়।

তোমার যদি তাই মনে হয়—আমার ভরণপোষণের জন্য তোমার বেতন এবং সম্পত্তির দু-ভাগের এক ভাগ আমাকে দিয়ে দাও, আমি বাপের বাড়ী চলে যাব।

তুমি আইনটাও জেনেছ দেখছি।

জানার কি আছে, অনিন্দিতার মা এর থেকে আমার অধিকার বেশী, কেননা আমাকে তুমি রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করেছ।

তোমার বিদ্যায় তো এসব জানার কথা নয়, কে তোমাকে এসব পরামর্শ দিয়েছে?

অনেকেই।

তারা কারা?

তোমার তো জানার দরকার নেই। হয় আমার কথা শুনবে না হয় আইনের পরামর্শ নেব। বেছে নাও কি করবে।

তাহলে শেষ কথাটা শুনে রাখো শুভ্রা—হয়তো তোমাকে অনেক কিছুই দিতে হবে, তবুও আইনের পরামর্শ নিয়েই তোমাকে আমি ডিভোর্স করব।

তোমার এত বড় স্পর্ধা।

কেন হবে না, রথিন যখন প্রথম কথা বলেছিল—এবং আমি যখন শেষ কথা বলতে গেলাম, তোমার বাবা, মা, দাদা এবং তোমার কাছে দেওয়া প্রথম শর্ত ছিল তুমি সন্তান নিতে পারবে না।

এটা কোন শর্ত হল, তাছাড়া প্রমাণ দিতে পারবে? তোমার লেখাজোখা বা আমাদের সইস্বাক্ষর কিছু আছে?

সত্যিই তো, কোন লেখা জোখাতো নেই। তাহলে কি রমেন রায় হেরে যাবে। আর যেন ভাবতে পারছেন না, অনিন্দিতাও ঘুমোচ্ছে, তাকে কি তুলবে, বলবে সব কিছু।

অনিন্দিতা ঘুমাতে পারে নি, সে সবকিছু শুনেছে, কেবল দীর্ঘশ্বাস ভরিয়েছে তার শোয়ার ঘর, তার মাথার পাশে এখনও তার বাবার বালিশ, যে বালিশে মা মারা যাওয়ার পর থেকে বাবার মাথাটা থাকতো। সেই পাশ বালিশ যার উপরে দুজনেই পাতুলে জড়িয়ে ধরত একে অপরকে, কত কথা হত দুজনের। এমনও দিন গেছে—সমস্ত রাত্রি দুজনে গল্প করে কাটিয়ে ভোরের পাখীর ডাকে বুঝতে পেরেছে রাত্রি শেষ। সেই বালিশ দুটোতে হাত বুলাচ্ছে অনিন্দিতা আর চোখের জল ফেলছে বিরামবিহীন।

তবু সে উঠে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি বাবা আর শুভ্রা মায়ের কথার মাঝে, সে তো জানে তার মত না থাকলে বাবা কখনও শুভ্রাকে ঘরে আনত না, সেই তো বলেছিল—"চল দুজনেই দেখে আসি" তাহলে আজ এভাবে ঝড়ের সংকেতে স্বপ্নের মীনার কাঁপে কেন? কেনই বা বাবা বার বার বলছে বাচ্চা নষ্ট করার কথা। মাঝে মাঝে তার মনে হয় উঠে গিয়ে বলে আসে আর নয় বন্ধ করো কাজিয়া, মেনে নাও সব। জটিলতা আর ভাল লাগে না ....

এভাবেই বিনিদ্র রাত্রি উদ্‌যাপন করে তিনটি মানুষ, ভোরের কোকীল ডাক দেয় কুহু কুহু, সূর্য ডাক দেয় ওঠ, জাগো। পুকুর ডাক দেয় গ্রামের বধুদের-আমাতে এসে সেরে নাও সকালের কাজ।

সকাল হয়েছে—যেন একটা ঝড়ের আপত বিরতির থমথমে ভাব, ঝড় উঠবে আবার যেকোন মুহূর্তে। মুখোমুখি হতে পারে না কেউ।

অনিন্দিতা দেখছে তার বাবাকে-যেন ঝড়ে দুমড়ে, মচড়ে যাওয়া একটা বট গাছ, যে গাছের ছায়ায় সে কাটিয়েছে জন্ম থেকে, বিশেষ করে মা মারা যাওয়ার পর। শুভ্রা মাকে দেখে—যেন ফুঁসছে অশান্ত নদীর মত, বাঁধ ভেঙে প্লাবিত করে দেবে গ্রামের পর গ্রাম যে কোন সময়। তারপর তৃপ্তি নিয়ে শুনবে আর্ত মানুষের কান্না।

থাকতে পারে না অনিন্দিতা—সে দাঁড়ায় তার হারিয়ে যাওয়া মা ব্রততীর ফ্রেমে বাঁধানো, শুকানো মালা দেওয়া ফটোর কাছে, তার মনে হয় মা যেন বলছে—"অনু ভেঙে পড়িস না মা, মাথা উঁচু করে থাক, তোর সামনে সুদূরের হাতছানি—সেখানে বন্ধুর পথ, সেই পথ ভেঙে ভেঙে যেতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়, হয়তো তোর পাশে কেউ থাকবে না, বাবাও নয়, তোকে একাই চলতে হবে সে পথে, আমি তোর পাশে পাশেই থাকব প্রতিটি সময়।"

অনিন্দিতা চিৎকার করে ওঠে—"মা, মাগো, আমি আর পারছিনা মা, তুমি বলে দাও, কোন পথ ধরে আমি যাব, কি বলব বাবাকে, কি বলব আজকের মাকে। আমি যে অপরাধী।" কান্নায় ভেঙে পড়ে অনিন্দিতা, কখন তার বাবা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে—তাও জানে না।

একটি শব্দ তার ধ্যান ভেঙে দেয়—'অনিন্দিতা।'

রমেনবাবু যেন স্থবির—স্পর্শ করতে পারে না তার মেয়েকে। তার যেন ভয় করছে অনিন্দিতাকে।

বাবা! তুমি এসেছ, কি দরকার ছিল ওসবের!

কি সবের মা?

যা করলে গত রাত্রে।

তুই ঘুমাসনি।

ঘুমোতে পারিনি।

আমার যে ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেল মা!

একথা বলছ কেন?

তোকে বোঝাতে পারব না।

আমি বুঝতে পারি বাবা, তোমরা মিটিয়ে নাও তোমাদের ঝগড়াঝাটি। আমি প্রথমেই যখন মেনে নিয়েছি, আজও মেনে নেব।

তুই এত বড় মন কোথায় পেয়েছিস্ মা!

তোমার কাছে, আমার মায়ের কাছে।

আমি যে দাম দিতে পারলাম না মা।

অনেক তো দিয়েছো, আমি তো সব শুনেছি।

আমাকে তুই ক্ষমা কর অনিন্দিতা।'

তুমি তো অন্যায় করোনি।

আমি মহা পাপ করেছি।

তুমি যে অনুতাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছো।

তুই অনেক বড় হয়ে গেছিস্, আমার থেকেও।

বাবা! তুমি মনে করোনা তোমার অনিন্দিতা অনিন্দিতাই হয়ে আছে অন্য কোথাও, তুমি তার কাছে প্রতিদিন যাচ্ছো, তাকে ভরিয়ে দিচ্ছো আদরে সেই ছোট্টবেলার মত।

সেই মা মারা যাওয়ার পর থেকে যেমন। আমি শুধু একটু দূরে, তোমাদের অশান্তির কারণ থেকে একটু দূরে!

তুই কি বলতে চাইছিস্।

ছোট মা চায় না আমার অস্তিত্ব এখানে থাক। আমাকে তুমি অন্য কোথাও ভর্ত্তি করে হোস্টেলের ব্যবস্থা করে দাও।

আমি পারব না মা, তোকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

কিন্তু?

আমি তো শুভ্রাকে বলে দিয়েছি, সমস্ত কিছুর অর্ধেক দিয়ে দেবো, সে যেন আইনি পরামর্শ নেয়।

ভুল করেছ বাবা, তাহলে তোমার ব্রততীর আত্মা শান্তি পাবে না, আমিও হীনমন্যতায় ভুগতে থাকব সমস্ত জীবন।

কিন্তু আমি যে আর সহ্য করতে পারছিনা।

আমি জানি, জানি বলেই বলছি তুমি সিদ্ধান্ত বদলে বাস্তবকে মেনে নাও।

সামনে তোর পরীক্ষা অথচ বাড়ীতে প্রতি মুহূর্ত যেন ঝড় উঠছে, তোর ক্ষতি হচ্ছে পড়াশুনার।

তাই যদি ভাব তাহলে বন্ধ কর সেই ঝড়।

রমেনবাবু শুভ্রাকে আর কোনদিন কিছু বলেন নি।

এদিকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা, শুভ্রা সময় মত যে একটু রান্না করে দেবে শরীর খারাপের অজুহাতে তাও পারছে না। রমেনবাবু রান্না করেন, মেয়েকে খেতে দিয়ে নিজে খান, খাবার বাসন ধুয়ে রেখে চলে যান নেড়াদেউল, সেখানেই পরীক্ষাকেন্দ্র।

সুপর্ণা তার কান্না দেখে বোঝায় মন খারাপ করে পরীক্ষা খারাপ হলে বড় হওয়া যাবে না, বরং মায়ের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে উঠতে হবে অনেক উপরে, দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে।

পরীক্ষা চলাকালীন অনিন্দিতা মাঝে মাঝেই শুভ্রার কথা শুনতে পায়—তোমাকে দিন দিন যেতে হবে কেন? তোমার স্কুল আছে, বাড়ীতে কিছু কাজ আছে, মেয়েকে নিয়ে পড়ে থাকলেই চলবে।

কেন তোমার কি ক্ষতি হচ্ছে?

হচ্ছে বলেই তো বলছি।

দেখ সংসারটা আমার, আমাকে বুঝতে হবে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ।

ঢের তো ভালো বোঝার ক্ষমতা।

সে বোধ যদি তোমার থাকতো তাহলে হাত পুড়িয়ে মেয়ের খাবার আমাকে তৈরী করতে হত না।

যার মেয়ে তাকেই তো করতে হবে। আমি কেন করব।

রমেনবাবু সহ্য করেন আরও অনেক কিছু। তিনি যেন পাথর হয়ে যাচ্ছেন।

শুভ্রা ভাবে তার ভবিষ্যতের জয় হয়েছে, সে আরও উদ্যম নিয়ে চেষ্টা করে এক একটি নিয়মের ফাঁসে রমেনবাবুকে বাঁধতে।

ফল বেরিয়েছে অনিন্দিতার, প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। রমেনবাবুর বুকটা যেন আবার চওড়া হচ্ছে একটু একটু। অনিন্দিতার বান্ধবীরা আগে প্রায়ই আসত, এখন তেমন আর আসে না, আসা পছন্দও করে না তার নতুন মা। ফল বেরুতে সবাই এসেছে। রমেন বাবু তার মত করে সবাইকে আপ্যায়ন করছেন, গল্প করছেন সবার সাথে আলোচনা চলছে উচ্চমাধ্যমিকের পছন্দের বিষয় নিয়ে। শুভ্রা অন্তর্লীনা তার কন্যা সন্তানকে নিয়ে। মাঝে মাঝে ফরমাস করছে এটা আন, ওটা আন, রমেনবাবু যেন গলদ ঘর্ম হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু মুখে কোন আলাদা অভিব্যক্তি নেই। ঢাকীদের মত ঢাক বাজাচ্ছেন কালীমন্দীরে আবার মনসাতলাতেও।

সবাই চলে গেছে যে যার বাড়ী, রাত্রি হয়েছে।

ইদানিং শুভ্রা খেতেও দেয় না অনিন্দিতাকে তার কোলে বাচ্চা বলে আগে ভাগে খেয়ে, সব কিছু ফেলে রেখে শুয়ে পড়ে সাত তাড়াতাড়ি। বাপবেটিতে খেতে বসে এক সাথে, বাসন ধুয়ে নেয়, অনিন্দিতা বুঝতে পারে তার ছোট মা আস্তে আস্তে সতমা হয়ে যাচ্ছে, তবু তার সাথে ভাল ব্যবহার করে, প্রত্যুত্তরে খারাপ ব্যবহার পায়। তবুও সব কিছু মেনে নিয়েছে কেননা সে অশান্তি চায় নি।

রাত্রিতে অনিন্দিতা শুনতে পায় কান্নার শব্দ, বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে শুনে বাবার সাথে মায়ের ঝগড়াঝাটি চলছে।

ছোটমা বলছে—ধিংড়ি মেয়ে ঘরে পুশে রেখে আমার উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে, হয় ওকে বিদায় কর নইলে আমি অশান্তি বাঁধিয়ে ছাড়বো।

কেন সে তো তোমার অশান্তির কোন কারণ হয় নি।

হয় নি, লোকের কাছে কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।

কি বলছে?

আমি নাকি খেতে দিই নি, ভালবাসিনা।

ওরা তো মিথ্যা বলছে না।

ওগো মাগো—তুমি দেখে যাও নিজের মানুষ হয়ে আমার অপবাদ দিচ্ছে। তাহলে তো লোকে বলবেই।

যা সত্য তাইতো সবাই বলছে।

তাহলে তুমি আমার কথা শুনবে না।

আজ তুমি যদি মারা যাও, তোমার মেয়ের প্রতি অন্য একটি মেয়ে এসে যদি তোমার মত ব্যবহার করে হয়তো স্বশরীরে তুমি দেখতে পাবে না, যেমন ব্রততী পায় নি কিন্তু বাবা হয়ে আমি কি পারব তার প্রতি অবহেলা সহ্য করতে!

কি? তুমি আমার মরন কামনা করছ।

তা করব কেন? উদাহরণ দিলাম।

ঐ একই হল, তোমার যদি তাই উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে আমাকে আনলে কেন?

দেখ মানুষ জীবনে ভুল করে, ভুলের ক্ষমাও আছে, কিন্তু আমার এ ভুলের কোন ক্ষমা নেই।

তুমি কি মানুষ, নিজের মেয়েকে ....

তোমারটা আমার নিজের, আর ব্রততীরটা পরের তাই না?

তা নয়তো কি—সে মরে গিয়ে একটা কাল সাপ পুষে রেখে গেছে।

শুনেছিলাম তুমি লেখাপড়া জানা মেয়ে! আদৌকি লেখাপড়া জানো, নাকি উদ্ধার করার জন্য তোমার বাবা মা এমন মিথ্যা বলেছিল।

আমার বাবা মা তুলছ। তোমাকে কি করতে পারি তুমি জানো?

হয়তো আর সহ্য হয়নি রমেনবাবুর, যে রমেন রায় জীবনে তার ছাত্র-ছাত্রীদের গায়ে হাত দেয়নি। সেই রমেন রায় এই প্রথমবার হাত তুলেছে তার রেজেস্ট্রি করা দ্বিতীয় পক্ষের এক অশিক্ষিত। মেয়ের গায়ে। চিৎকার করে কাঁদছে শুভ্রা।

থাকতে পারেনি অনিন্দিতা দরজায় কড়া নাড়ে। খিল খুলে বেরিয়ে আসেন রমেন বাবু, যিনি এই মাত্র রাগে ফুটছিলেন হঠাৎ বাচ্চা ছেলের মত মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেন আমাকে তুই যেন কখনও ক্ষমা করিস না মা—আমি ভীষণ অন্যায় করেছি।

এই প্রথম অনিন্দিতা তার সত্মাকে বলে—

একটা বোধহয় ভুল করছ মা, বাবার কিছু হয়ে গেলে তুমি পথে বসবে।

কেন পথে বসব? আমার অধিকার সবচেয়ে বেশী। আর পথে বসলে—তুই তার কারন হবি।

পাড়া প্রতিবেশী তোমাকে দেখছে, তারাও তোমাকে সমর্থন করবেনা।

দরকার নেই।

তুমি আইনের কথা বলছ তো?

তোরা তো বাধ্য করছিস্।

তা কিন্তু প্রমাণ হবে না। স্বার্থপরতা ভাল, কিন্তু কারও ক্ষতি করে নিজের কথা ভাবা বোধ হয় খুব একটা ভাল নয়।

তুই আমাকে উপদেশ দিচ্ছিস্।

না মা, সে ক্ষমতা আমার নেই, আমি যা বলছি, চেষ্টা করো সেটা বোঝার।

তুই কি বোঝাবি, তোরা তো চাস্ আমি এই বাড়ী থেকে চলে যাই।

না আমি তা বলছিনা—আমি বলছি এক সংসারে তুমি, আমি, বোন সবার অস্তিত্ব সমান, সবাই সবার জন্য, এই বোধটুকু মনে এলে জ্বলে যাওয়ার হাত থেকে মুক্তি পাবে, তুমি ভাবতে শেখনা তোমার দুটি মেয়ে।

কেন ভাবতে যাব?

আমি কিন্তু এর পরেও তোমাকে মা এর আসন থেকে সরাইনি।

আমাকে কৃতার্থ করেছ। আমি আজ থেকে তোর মা নয় একথা বলে দিলাম।

আর একবার ভেবে দেখ।

আমার ভাবা হয়ে গেছে।

তাহলে জেনে নাও যে আসনে তোমাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম আজ থেকে সে আসন তোমার নয়।

কেন কি করবি তুই?

বুঝতে পারবে।

খবর পেয়ে শুভ্রার বাপের বাড়ী থেকে মা বাবা এসেছেন দাদা এসেছে, সবাই তাকে বুঝিয়েছে তাদের মত করে। তার একই কথা ওরা আমাকে বাঁচতে দেবে না? তোমরা কিছু একটা ভাব নইলে আমি থানায় যাব।

পাড়ার অনেকে এসেছে তাদের কাছে শুভ্রার বাড়ীর সবাই শুনেছে শুভ্রার অভদ্রতার কথা, নিরুত্তর থেকেছে সবাই।

পাটি নেতৃত্ব এসেছে,—তারা বোঝানোর চেষ্টা করেছে।

তাদের কথাও শুনে নি, অভিশাপ দিয়েছে অনিন্দিতাকে, রমেনবাবুকে, অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোক আদালত বসিয়ে। শুভ্রা বাপের বাড়ী চলে যাবে, তার মাসের খরচ হিসেব করে দিয়েছে লোক আদালত সেই অনুযায়ী রমেনবাবু মাসিক দুহাজার টাকা পাঠাবে শুভ্রাকে।

শুভ্রা চিৎকার করে—আমার সব চাই, আর চাই অনিন্দিতা চলে যাক এ বাড়ী থেকে, কেন না আমিই তার বৈধ স্ত্রী।

নেতৃত্ব জিজ্ঞাসা করেছে—অনিন্দিতা কোথায় যাবে?

আমি কি জানি, যার মেয়ে সে ভাববে।

পাগল, বদমাইশ বলে—সবাই চলে যাচ্ছে এক এক করে।

শুভ্রার বাবা মা দাদা যাচ্ছেতাই করছে শুভ্রাকে। এমন কি বলেছেন—এ মেয়ে যদি মরেও যায় আমরা কাউকে কোন দোষ দেব না।

শুভ্রা তার উত্তরে বলেছে—তোমরাও তাই চাও, বেশ তবে তাই হবে।

বাবা মা জোর করে তাকে নিয়ে চলে গেছে তাদের বাড়ী।

.

রমেনবাবু ব্রততী মারা যাওয়ার পর থেকে যেখানে থাকতেন তার মেয়ের সাথে তেমনই থাকেন।

বিভিন্ন চিন্তায় দিন দিন শরীর ভাঙছে রমেনবাবুর, তবুও তার স্বান্তনা অনিন্দিতা।

অনিন্দিতা উচ্চ মাধ্যমিক দিচ্ছে চন্দ্রোকোণা কেন্দ্রে। যে কেন্দ্রের দায়ীত্বে আছেন শেখরবাবু।

সুপর্ণা বসেছে একই বেঞ্চে—

মাঝে মাঝে দেখছে অনিন্দিতার চোখে জল। তার গলায় ঝুলানো তার মায়ের ছবি দেখছে আবার জামার ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে ছবি স্পর্শ করে আছে অনিন্দিতার হৃদয়। তার হাতে সেই কবেকার রুমাল যে রুমালে করে নিংড়ে নিচ্ছে চোখের জল, ইনচার্জ হয়তো দেখেছেন, অথবা দেখেছেন কিনা জানা যায় নি। তিনি তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন বার বার, কেননা একবার একটি পরীক্ষার্থীকে নিজের মেয়ে ভেবে আঘাত পেয়েছেন, যে আঘাত মৃত্যুর থেকেও ভয়ঙ্কর।

সুপর্ণা তাকে কিছু বলতে পারে নি, সে জানে মানুষকে কাঁদতে হয়, কাঁদলে মন হালকা হয়, বিশেষ করে মা হারানোর বেদনা থেকে।

———

সারেঙ্গীটা বাজছে

বিদিশার চোখে ঘুম নেই। রাত্রি গভীর। ঘাগুরা খুলে রেখেছে আলনায়, খুলেছে শরীরের সব অন্তর্বাস, পরেছে নাইট গাউন, মেকাপ তুলেছে, চুল খুলেছে, ঘুঙুর খুলেছে, স্নান সেরেছে। সেই সন্ধ্যা থেকে রাত্রি বারটা পর্যন্ত বাবুদের জন্য মুজরোয় নাচ গান মোটা টাকা হয় তো বকসিস্ আসে। তার ভাগ দিলেও প্রচুর টাকা, কিন্তু শরীর তো। তার আর দোষ কি, একরাশ ক্লান্তি, বিরক্তির একশেষ, আর যেন বয় না। অন্যান্য দিন খাওয়ার সময়ই ঘুম পেয়ে যায়, আজ আসছে না।

কুন্তল এসেছিল দীর্ঘ দশ বৎসর পরে সাদা তিন তলার সবচেয়ে উপর তলায়, যেখানে মুজরো বসে প্রতিদিন। যেখানে প্রতিদিন না হলেও নিত্য নূতন বাবুরা আসে, কেউ কেউ মাসে দু তিনবারও আসে। কুন্তলকে এই প্রথম দেখা গেল এই মুজরোর কয়েক মাসের ইতিহাসে। কেন না বিদিশা এখানে কয়েক মাসই এসেছে। মাথার কোঁকড়ানো ব্যাকব্রাশ চুলে দু একটা সাদা ছোপ ধরেছে, সেই পরিপাটি ছাঁটা গোঁফ, চেহারা হয়তো একটু ভারী হয়েছে, কিন্তু উজ্জ্বলতায় সেই আগের মতই। বিদিশা প্রথমে চিনতে পারেনি চিনেছে অনেক পরে যখন মুজরো শেষ পর্যায়। সিগারেট ধরিয়েছে কুন্তল, সিগারেটে টান মেরে ধুয়োটা কিছুক্ষণ রেখে রিং এর মত করে ছাড়তো তখন, আর তার চোখ দুটো যেন শিব চক্ষু হয়ে যেত। তার কপালের ডানদিকে কাটা দাগ—সেই পুরানো অভ্যাস দেখে। কুন্তল কিন্তু চিনতে পারে নি, আর পারবেই বা কি করে এখন সে রুক্মিনি বাই, বিদিশা নয়।

মুজরোয় বাঁধা অনুষ্ঠান করত ঝিন্দন বাই, ঝিন্দন বাই যখন কলকাতায় মুজরোওয়ালী হয়ে ফিরে আসে তখন তার মেয়ে বিদিশার বয়স বার বৎসর। আলাদা কোন বাসা বাড়ী ছিল না বলে থাকতে হত ঐ বাড়ীরই একটি সাজানো গুছানো ঘরে, বিদিশা ফাঁকফোঁকরে দেখেছে তার মায়ের আসর আর টাকা উড়ে তার পায়ের তলায় পড়া। মদের পেয়ালায় চুমুক দিত সব বাবুরা, উল্লাস ফেটে পড়ত মায়ের নৃত্যের তালে তালে, এক সময় শেষ হত নাচ গান, শুরু হত বকসিস্ দেওয়ার পালা, কেউ কেউ রয়ে যেত রাত্রে অনেক নজরানার বিনিময়ে তারপর লঘু মূহুর্তের উল্লাস সেরে গভীর ঘুমের মধ্যে হারিয়ে যেত সমস্ত রাত্রি, ভোর হলে মা ঘুম থেকে তুলে সসম্মানে বিদায় জানাত আবার আসার জন্য নিমন্ত্রণ করে, এমনই চলত প্রতি রাত্রে, জমা পড়ত অনেক অনেক টাকা, জীবনের বিনিময়ে, শরীরের বিনিময়ে।

ঝিন্দন ছিল না, নাম ছিল ঝিনুকমালা নায়েক— বিদিশা তার মায়ের কাছে শুনেছে, যখন বিদিশার বয়স পনের বৎসর। নামটা নাকি তার ঠাকুমা দিয়েছিল, ঠাকুমা মারা গেল। মারা গেল ঝিনুকের বাবা, মা, বস্তির মধ্যে তাদের বাস, যেখানে পেটের তাগিদে বহিরাগতদের

প্রায়শই আমন্ত্রণ হেতু আগমন। সামান্য পয়সার বিনিময়ে ভোগবিলাস সেরে চলে যেত রাতের অন্ধকারেই। বস্তির মেয়েদের উপরি ঐটুকু রোজগার ঐটুকু নয় যেন অনেকে চাল ডাল নুন তেলের জোগাম। ঝিনুকমালার বয়স তখন চোদ্দ পনের তার ঘরে পাড়ারই এক মেয়ের সাথে শুয়ে শুয়ে সব দেখেছে। কখনও কখনও দেখেছে তারই ঘরের বাঁশের দরজায় কাউকে কাউকে উঁকি ঝুঁকি মারতে, ভয়ে কাঠ হয়ে যেত। এইভাবেই ভয় আর সাহসে ভর করে চলছিল সবকিছু। একদিন রাত্রিতে শুনল তার জন্য দর কষাকষি চলছে এক লম্বা ছিপছিপে তেখেঁচড়া মার্কা লোকের সাথে, যে দাম করছে তাকে ঝিনুক 'মাসী' বলত। তার কাছেই দুমুঠো খেয়ে কোনরকমে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখত। পরের দিন রাত্রে তাকে নিয়ে চলে যাবে সেভাবেই রফা হয়ে গেছে। আর দেরী করেনি ঝিনুক, ভোরের আকাশে সূর্য লাল হওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়—কোথায় যাবো। ঠিকানা জানে না, কেবল পথ চলা আর পথ চলা। খিদের জ্বালায় জ্বলছে পেট, হাঁটার ক্ষমতা নেই, তবু ভয় তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে অজানার হাতছানিতে।

সন্ধ্যা শেষ হয়েছে—রাত্রি এসেছে ধীর গতিতে ক্লান্ত শরীর যেন তাকে টেনে ধরেছে পিছনের দিকে, ভয় টানছে সামনের দিকে। তখন রাত্রি গভীর আর যেতে পারেনি ঝিনুক বসে পড়েছে গঙ্গার ধারে এক বটের তলায় যেখানে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করে পূজো দিতে আসে মাড়োয়াড়ীরা।

ভোর হয়ে গেছে ঝিনুক জানতে পারেনি, কেননা ক্লান্তিতে সে ঘুমিয়েছে অবশিষ্ট রাতটুকু, ঘুম ভেঙে গেছে এক রাশ ভারি গলার আওয়াজে।

গঙ্গায় স্নান সেরে পূজো দিতে এসেছে হরপ্রসাদ। তার বয়স আর কত হবে বাইস তেইস। সে মেয়েটিকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে তাকে ঘুম থেকে তুলে জিজ্ঞাসা করার পরে জানতে পেরেছে তার ইতিহাস, তাকে বসতে বলে পূজো সেরে নিয়ে গেছে তার ভাড়া করা বাসায়।

কয়েকদিন সেখানে থাকার পর আবার শুরু হয়েছিল ঝিনুকমালার ভেসে যাওয়া হরপ্রসাদের সাথেই। বেনারসে হরপ্রসাদের বাড়ী, বাড়ীতে তার সবাই আছে, এক অপরিচিত মেয়েকে রাখা—বিশেষ করে যে বাংলা ছাড়া কিছুই জানে না তার সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মেয়েটির প্রতি তার মায়া যেন অন্য মাত্রা পেয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

এক সন্ধ্যায় হরপ্রসাদ শুনতে পায়, ঝিনুক একা বসে আছে তাদের বাগানে, কেউ কোথাও নেই, গান করছে ঝিনুক—হিন্দি গান তাদের বস্তিতে রেডিও থেকে শুনে শেখা। গলার মিষ্টি সুর হরপ্রসাদকে নাড়িয়েছিল সেইদিন। জিজ্ঞাসা করেছিল গান শিখবে? বোকার মত কেবল তাকিয়েছিল ঝিনুক।

তাকে হরপ্রসাদ যেন তার বাড়ী থেকে মুক্তি দিতে চায়। কিন্তু পথ ছিল না, এবার পথ

পেল হরপ্রসাদ। ওস্তাদের বাড়ী নিয়ে গেল তাকে, বৃদ্ধ ওস্তাদ, তার স্ত্রী সেখানকার বিখ্যাত নর্ত্তকী সেও বৃদ্ধা, সাতকূলে তাদের কেউ কোথাও নেই, হরপ্রসাদের কাছে সবকিছু শুনে তারা রেখেছিল ঝিনুককে। ঝিনুক গান শিখে, ঝিনুক নাচ শিখে। ঝিনুক বৃদ্ধা বৃদ্ধকে সেবা যত্ন করে বাবা মায়ের মতই। একদিন সন্ধ্যায় ভীষণ জ্বর আসে ওস্তাদের। ছট্‌ফট্ করে ওস্তাদ, না সে জ্বর থেকে সে সুস্থ হয়নি কিন্তু সুশীতল হয়ে যায়। এখন বৃদ্ধা নর্ত্তকী আর ঝিনুক, মাঝে মাঝে দেখে যায় হরপ্রসাদ, যেন কর্তব্যের খাতিরেই। তখন ঝিনুক আরও বড় হয়েছে, যত্নে আভিজাত্যে থেকে থেকে সুন্দরীও হয়েছে বেশ। নাচ শিখেছে খুব সুন্দর, অনুষ্ঠান করছে বিভিন্ন ছোটখাটো আসরে। প্রচার পাচ্ছে বেশ। একদিন এক হোটেল বার এর মালিক এসেছে ঝিনুকের কাছে। বৃদ্ধা প্রথমে রাজী হয় নি। তারপর অনেক শর্ত সাপেক্ষে রাজী হওয়ার পর সপ্তাহে দুদিন যায় হোটেল বারে। রোজগার শুরু করে ঝিনুক, সব ঠিক চলছিল। ঝিনুকের হঠাৎ একদিন তার শিক্ষাদাত্রী আশ্রয়দাত্রী ভোররাত্রিতে ঘুমের মধ্যে মারা যায়।

নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে ঝিনুক, হরপ্রসাদ আসে তাকে সান্তনা দিতে। তখন ঝিনুক বড় নর্ত্তকী হয়ে গেছে। ভীষণ তার নাম, টাকা আসছে উড়ে উড়ে।

নাম বদলে গেছে ঝিনুকের সে তখন ঝিন্দন বাই, তার মুজরোয় ডাক, তার বারে ডাক, তার বৈঠকী আসরে ডাক, সে যেন হাঁপিয়ে উঠছে। তবু বিশ্রাম নেই, নেই টাকার অভাব। হরপ্রসাদ তাকে দেখে মাঝে মাঝেই—যেন এক অপূর্বা সুন্দরী। সেটা কখনও তার মনে আসেনি এখন মনে আসতে শুরু করেছে। সে যেন ভালবাসতে শুরু করে ঝিন্দনকে, বলতে পারে না বাসায় যায়, তাকিয়ে থাকে তার দিকে। ঝিন্দন একদিন মজা করে বলে—কি দেখছ এমন করে। আগে তো কখনও এভাবে দেখনি। বলতে পারেনি হরপ্রসাদ—সে কি দেখছে।

ঝিন্দন বলে—আমি খুব সুন্দরী হয়েছি তাই না।

হরপ্রসাদ বলে খুব। তারপর বলে তুমি ঝিনুক হতে পারনা?

ঝিনুকই তো ছিলাম, তুমি ঢাকা খুলতে পারনি এখনও।

ঝিন্দন—ঝিনুকের খোল থেকে মুক্ত।

হরপ্রসাদ বলে—একটা কথা ছিল ঝিনুক। যা কোনদিন বলতে পারিনি।

অনেক দেরী করলে শেঠজী, আমিও দেরী করেছি, কিন্তু বলতে পারিনি।

আজ যদি আমরা দুজনেই বলি—ক্ষতি কি।

এইভাবেই কাছাকাছি আসে এক অপূর্ব সুন্দরী এক অপরূপ সুন্দর।

শেঠজীকে অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছে ঝিন্দন, সব কিছু তাকে দিয়েছে—সে যা চায়, ঝিন্দন পেয়েছে শূণ্যতায় ভরে যাওয়ার আস্বাদ, কেউ কাউকে ছাড়া যেন থাকতে পারে না।

একসময় হরপ্রসাদ ঝিনুককে বলে তুমি সব ছেড়ে দাও। আমাদের বাগান বাড়ীতে থাকবে, সেখানে আমি যাব সপ্তাহে সপ্তাহে। এভাবে পরিশ্রমও করতে হবে না।

ঝিন্দন বলেছে—কি পরিচয়ে?

উত্তর দিতে পারেনি হরপ্রসাদ। এইভাবেই চলে মাসের পর মাস। ঝিন্দন একদিন জানতে পারে তার পেটে আসছে শেঠজীর বাচ্চা। শেঠজীকে বলার পর সে নষ্ট করে দিতে বললে ঝিন্দন নারাজ। সম্পর্কের ভীত নড়তে থাকে আস্তে আস্তে তারপর হারিয়ে যায় ঝিনুকের ভালবাসার মানুষ শেঠজী। বহুবার খোঁজ নিয়ে জেনেছে সে কলকাতায় চলে গেছে। এখন ফিরবেনা।

ঝিন্দন মা হওয়ার স্বপ্ন দেখত অন্যান্য মেয়েদের মতই, সে মা হতে চায়, হয়তো পিতৃ পরিচয় থাকবে না তবু বহন করে চলে দশ মাস দশ দিন। মা হওয়ার খবর রটে গেছে সব জায়গায়। মুজরোতে তেমন কেউ আর ডাকে না, এদিকে জমানো টাকা খরচ হতে হতে অনেকখানি শেষ, মেয়ে বড় হচ্ছে একটু একটু করে, তার খরচও বাড়ছে। আবার যেন ভাসতে শুরু করে ঝিন্দন, হঠাৎ একদিন তার কাছে আসে শিউনারায়ণ শর্মা, জহুরীর জহর চেনার মত। ঝিন্দনের কাছে যায় মাঝে মাঝে, তাকে সাহায্য করে বিভিন্নভাবে, আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায় আগের মুজরোয়, আবার পুরানো জীবন, মেয়ে বড় হচ্ছে দিন দিন।

শিউনারায়ণ কলকাতায় যাবে তাদের অন্য ব্যবসাস্থলে, প্রস্তাব দেয় ঝিন্দনকে কলকাতায় যাওয়ার, সেখানে মুজরোতে তার সব ব্যবস্থা করে নিয়ে যায়। তখন বিদিশার বয়স বার বৎসর।

শিউনারায়ণ ঝিন্দনের অনুরোধে ওস্তাদ এনেছে—মেয়ে নাচ শিখবে। এনেছে গানের গুরু—গান শিখবে। বিনিময়ে শিউনারায়ণের বাঁদী হয়ে গেছে ঝিন্দন। শিউনারায়ণ তার কামনার আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছে ঝিন্দনকে, আর ঝিন্দন তার চটুল লাস্যে মন জয় করছে শিউনারায়ণের। এরই মাঝখানে বিদিশা ধীরে ধীরে তৈরী হচ্ছে বড় নর্তকীতে, ঠুংরি, গজলে।

বিদিশার বয়স যখন পনের, তাকে কোন কোন সুযোগ দিচ্ছে ঝিন্দন, শিউনারায়ণ গাড়ী দুর্ঘটনায় মারা গেছে। ঝিন্দনের মনে আবার নিরাপত্তাহীনতার ঝড়। যাকে ধরতে যাচ্ছে আপন করে নেবে বলে—হরপ্রসাদজী তাকে শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়ে চলে গেছে, শিউনারায়ণ নেই, বিদিশা বড় হয়েছে। কি করবে সে, কার সান্নিধ্যে বাঁচবে সে।

মুজরোতে যেতে ইচ্ছে করে না তার, তবু যেতে হয়, কেননা মেয়ে তখনও পেশাদার হতে পারেনি, বিভিন্ন প্রলোভন থেকে গা বাঁচিয়ে চলার কায়দায় সে রপ্ত হয় নি, যদি এই বয়সেই সে সব হারিয়ে ফেলে তাহলে আর কোন দিন উঠে দাঁড়াতে পারবে না, এই বয়সটাও ভাল নয়।

এইভাবেই শুরু হয় তার মস্তিষ্কের বিকৃতি। বিদিশা তখন ষোল। আসর মাতাচ্ছে

প্রত্যেক রাত্রি। সবাই যেন শকুনের চোখে দেখছে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভঙ্গী, এমন কি শরীর। এমন কি কেউ কেউ প্রস্তাবও দিয়েছিল তার সাথে রাত্রি যাপনের, সে কাউকে পাত্তা দেয় নি।

এক রাত্রিতে ফিরে এসে সে দেখতে পায় এক বয়স্ক ভদ্রলোককে মায়ের সাথে কথা বলতে, তাদের কথাবার্তায় তীব্র উত্তেজনা। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে পায় তার জন্ম নিয়ে একপ্রস্থ বিতর্ক এবং জানতে পারে তার জন্মদাতার পরিচয়, সে ঐ ভদ্রলোক, কিন্তু ভদ্রলোক সেখানে মাকে বলে যাচ্ছে—ও বেজন্মা, অন্যকারও, তার নয়। এরপর তার পাশ দিয়ে চলে যায় বাইরে, তার দুদিন পরে মুজরো থেকে ফিরে এসে বিদিশা দেখে তার মা সিলিং ফ্যানে দড়ি লাগিয়ে নিজের গলায় ফাঁস নিয়ে ঝুলছে খাটের পাশে।

চিৎকারে লোকজন জুটে গেছে। তিনতলা সাদা বাড়ীতে পুলিশ এসেছে। পুলিশ তন্নতন্ন করে সমস্ত ঘর খুঁজছে, তাদের নজরে পড়েছে একটি গ্যাস লাইটার।

সেদিন মুজরোর মালিক আর বিদিশাকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ, মরণাতদন্ত হয় ঝিন্দন বাইয়ের। জানা যায় তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। চার পাঁচ দিনের মধ্যে পুলিশের সহৃদয় প্রচেষ্টায় লাইটারের সূত্র ধরে বিদিশার বিবরণ শুনে ধরা পড়েছে হরপ্রসাদ। বিদিশা, মুজরোর মালিক ছাড় পেয়েছে পুলিশের হাত থেকে।

তারপর বিদিশা যে কদিন ছিল, ন্যানা মন্তব্য, ভয় দেখানো থেকে শুরু করে তার মনের উপর যত রকমের অত্যাচার শুরু করে কোথা থেকে আসা কিছু উটকো লোক, ভয় পায় বিদিশা।

এক একটি রাত কাটে নীদ্রাহীনতায়, উৎকণ্ঠায়, কোন কোন দিন সে শুনতে পায় কারও কারও পায়ের শব্দ তার তিনতলার দরজার ওপারে, কোন কোনদিন তাকে কেউ না কেউ ডাকে বাইরে আসার জন্য।

এইভাবে প্রতিদিন চলতে থাকার পর সে সিদ্ধান্ত নেয়, চলে যাবে তিনতলা বাড়ী থেকে। মুজরো সেরে এসে তার সাজ পোষাক, সোনাদানা, টাকা পয়সা ব্রিফকেসে ভরে ভোরের আগেই বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়, সেখানে একটা ট্যাক্সি করে চলে যায় হাওড়া স্টেশনে। সেখান থেকে বেনারস।

ঝিন্দন বেনারসের গল্প বহুবার করেছে তার কাছে। তার ওস্তাদ আর তার স্ত্রীএর কথা, আরও শুনেছিল ওস্তাদের আর এক প্রিয় ছাত্রের কথা, সে তখনও বিয়ে করেনি, তার বাড়ীর খবর সবকিছুই বলেছিল ঝিন্দন।

বিদিশা বেনারসে এক লজে থেকে সেই মানুষটি খোঁজে বেরোয় প্রতিদিন। সে কিছু কিছু পথ জানত তার মা ঝিন্দনের সাথে মাঝে মাঝে বেড়াতে বেরিয়ে।

একদিন লজে বিকালে ফিরছিল বিদিশা, একটি ছেলে বয়সে প্রায় বাইশ তেইশ হবে,

বিদিশাকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল আপনাকে এখানে প্রায় প্রতিদিন দেখছি। আপনি দু একজনের সাথে বাংলায় কথাও বলছেন, যদি কিছু না মনে করেন তাহলে জিজ্ঞাসা করি—আপনি কি বাঙালী?

হয়তো তাই।

কোথায় বাড়ী?

কোলকাতায়।

এখানে কোথায় এসেছেন?

দেখতেই তো পাচ্ছেন—সামনের লজে।

না ঠিক তা নয়—আপনি কার খোঁজে কোথায় এসেছেন?

না তেমন কারও নয়, বেনারসেই থাকতাম আমি আমার মা, তাই বেড়াতে এসেছি। কিন্তু আপনি?

আমি কুন্তল রায়, কলকাতার বাসিন্দা।

এখানে কেন?

ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে মাঝে মাঝেই আসতে হয়। আর আসলে এই লজটাতেই থাকি। এইভাবেই পরিচয় পর্ব—এইভাবেই এগিয়ে যেতে থাকে তাদের সম্পর্কের বুনন।

একই লজ, একজন পাঁচতলায়—সে কুন্তল, একজন চারতলায় সে বিদিশা, ব্যবধানে অনেক কিন্তু মনের ব্যবধান কমতে কমতে শেষে দর্শন। আয়ত চোখ, কাল কুচকুচে কোঁকড়ানো ব্যাকব্রাস চুল, তাকে দেখে, মনে মনে নরম হৃদয় মানুষটির ছবি আঁকতে থাকে বিদিশা।

কুন্তল ভালবাসতে শুরু করে বিদিশাকে, বিদিশা যে নর্ত্তকীর মেয়ে জানায়নি কোন দিন, জানেও না কুন্তল।

সে ভালবাসা প্রগাঢ় হতে হতে একসময় দুজন দুজনের একান্ত সান্নিধ্যে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করে এক গভীর রাত্রিতে এবং সেই প্রথম বার এবং কুন্তলের সাথে সেই শেষ বার।

কুন্তল সিগারেট খেত খুব বেশী, তার সিগারেটের ধূয়া রিং করে ছুঁড়ে দিত বিদিশার দিকে তারপর চোখ দুটো শিব চক্ষুর মত করে সেই সিগারেটের আমেজে মসগুল হত প্রতিটি টানে টানে। মজা করত বিদিশা, তখন কুন্তল কোন কথা বলত না, কেবলই একটা গাম্ভীর্যের মোড়কে নিজেকে রেখে শেষ করত সিগারেট।

তখনও কোথায় যাবে স্থির করতে পারে নি বিদিশা, প্রাত্যহিক নিয়মের মতো নিয়ম করে খোঁজ করছে তার মায়ের ওস্তাদের শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে। তার নাম ছিল ফৈজি শেখ। কোন কোন দিন কুন্তল থাকত সাথে। কোথায় সে থাকে। কেউ তেমন কিছু বলতে পারছে না, কিন্তু তাকে সবাই চেনে বিখ্যাত গজল গাইয়ে হিসেবে।

কুন্তল এবার ফিরে যাবে কলকাতায়। তার বেনারসের কাজ শেষ। একদিন বিদিশাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি বাঙালী, কলকাতায় এত নামীদামী ওস্তাদ অথচ ফৈজি শেখকে খোঁজ করতে এখানে এসেছ কেন?

বিদিশা বলেছিল—তার মৃতা মায়ের ইচ্ছে ছিল যেন ফৈজির কাছেই তালিম নেওয়া হয়, তাই এখানে আসা।

আর কোন প্রশ্ন করেনি কুন্তল। বিদায়ের আগের রাত্রে তারা দুজন দুজনের কাছে অঙ্গীকার করেছিল বেনারস থেকে ফিরে গিয়ে হয়তো দুচার বছর পরে আবার মিলিত হবে পরস্পর, বিবাহ বন্ধনের মধ্য দিয়ে। এর বেশী কিছু নয়।

কুন্তল চলে গেছে কলকাতা। বিদিশা বেনারসে। হঠাৎ একদিন শুনতে পায় মাইকে ঘোষণা চলছে জনাব ফৈজি শেখ তার বৈঠকি আসর করবে এ মাসের কুড়ি তারিখে লন্ডন থেকে ফিরে। সেই প্রথম জানতে পারে বিদিশা তার মায়ের কথাই ঠিক। ফৈজি ওস্তাদের শ্রেষ্ঠ ছাত্র। অপেক্ষা করে ঐ অনুষ্ঠানের জন্য, ঐ দিন বিদিশা দেখা করবে ফৈজির সাথে। দেখা করেছিল বিদিশা, পরিচয় পর্ব শেষে জেনেছিল, ফৈজি এখনও মনে রেখেছে ঝিন্দন বাইকে। আরও জেনেছে ফৈজি অপেক্ষা করেছিল ঝিন্দনের জন্য কিন্তু ঝিন্দন তার কাছে ধরা দেয়নি কারণ হরপ্রসাদের বাধা। তারপর আর দেখা হয় নি। আনন্দিত হয় বিদিশাকে দেখে—যাকে তখন ফৈজি দেখেছিল ফুটফুটে একটি ছোট্ট শিশু। সে আজ অনেক বড় হয়ে গেছে এবং তার কাছেই ফিরে এসেছে তার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে।

ফৈজি বিয়ে করেনি—আজও। এখানে ওখানে যায় অনুষ্ঠান করতে। এই তো কদিন আগে লন্ডন গিয়েছিল ফিরেছে গতকাল, আবার সামনের মাসে যাবে আমেরিকা। তার আর যাওয়া হল না বিদিশার জন্য। আদর্শ বাবার মত বিদিশাকে কাছে রেখেছে, তালিম দিচ্ছে এক একটি রাগের উপর, রেখেছে একজন নাচের ওস্তাদ, গানের সাথে মিশিয়ে চলছে নাচের অনুশীলন। তারপর এক একটি অনুষ্ঠানে পিতাপুত্রীর যুগলবন্দীতে মুগ্ধ করছে লক্ষ লক্ষ শ্রোতাকে, বিদিশা নায়েক কখন সবারই কাছে হয়ে গেছে বিদিশা নেইকা।

সব চলছিল সুন্দর গতি নিয়ে। মনে কেবল কুন্তল, কারও সাহস হয়নি তার পাশে আসার ঔদ্ধত্ত দেখাতে। কেননা ফৈজি তার ছায়া সঙ্গী, ফৈজি তার বাবা, ফৈজি তার শিক্ষাগুরু।

প্রস্তাব যে আসে নি তা নয়, বিখ্যাত বারগুলোর মালিকরা এসেছে ফৈজির কাছে। ফৈজি এক কথায় তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে নিঃসঙ্কোচে।

সেদিন বিদিশার শরীর খারাপ অথচ অনুষ্ঠান রয়েছে বেনারস শহরে। প্রচার হচ্ছে পিতাপুত্রীর যুগলবন্দী হবে সমস্ত রাত্রি। অথচ যাবে না বিদিশা, ফৈজির মন খারাপ বিদিশার জন্য। আবার অন্য চাপ অনুষ্ঠানের জন্য। কি করবে ঠিক করতে পারে না সে, খবর পাঠায় কর্মকর্তাদের কাছে, তারা নাচার। কেউ ভাবে নি শরীরের সুস্থতা অসুস্থতার কথা, কেননা

তাদের আকর্ষণেই সমস্ত টিকিট অগ্রীম বিক্রি হয়ে গেছে। অসুস্থ বিদিশাকে নিয়ে গিয়েছিল ফৈজি, নাচতে নাচতে অজ্ঞান হয়েছিল বিদিশা, জ্ঞান যখন ফিরল সে নিজেকে আবিষ্কার করল হাসপাতালের শয্যায়, আর জানল ঐ রাত্রেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ফৈজি তার বাবা গাড়ী নিয়ে ফিরে আসার পথে সামনের দিক থেকে আসা গাড়ীর ধাক্কায় মারাত্মক আঘাত পেয়ে একই হসপিটালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে—যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে। ঐ কদিন বিদিশা ছেড়ে আসেনি ফৈজিকে। তাকে দেখতে এসেছে অনেকেই, সঙ্গীত জগতের, বিভিন্ন বারের, সিনেমার প্রযোজকরা—সবাই।

বাঁচাতে পারেনি ফৈজিকে। ডাক্তারের সবরকমের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ফৈজি চলে গেছে অন্যলোকে আর বিদিশা রয়ে গেছে পিতৃ মাতৃহীণ একা নিঃসঙ্গ নিরাপত্তাহীণা।

তার নাচের গুরু তাকে তখন প্রস্তাব দেয় বারে যাওয়ার জন্য। বিদিশা কি করবে ভেবে স্থির করতে সময় নেয় বেশ কিছুদিন। তারপর রাজী হয়ে যায় একটা সময়।

কিন্তু পরিচয় নিয়ে পড়ে যায় সমস্যায়। সে যা চায়নি, সে যা দেখেছে তার মায়ের বেলায়—ঝিনুক হয়ে গেছে ঝিন্দন বাই, কিন্তু নিরূপায় বিদিশা—নেইকা—সে বারে গিয়ে রুক্মিণী বাই, সে এখন বারের নর্ত্তকী। কখনও কখনও আমন্ত্রিত হয় বিশিষ্ট মুজরোয় যেখানে মদের ফোয়ারায় ভাসে বিশিষ্ট বাবুরা, যেখানে টাকা ওড়ে ঝাঁক ঝাঁক পায়রার মত, যেখানে টাকা উড়তে উড়তে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে গুলিবিদ্ধ মৃত পায়রার মত—যাদের শরীরে রক্তের মতই মদের আর কামনার স্রোত। রুক্মিণী বাই নৃত্য বিভঙ্গী নিয়ে গেয়ে চলে।

সজনা তুহে নেহি যাঁয়ু
মুঝে ছোড়কে।
ম্যায় আভি ইঁহা সারি রাত
সরাব পিতে পিতে
খুসবু আঁয়ে খুসবু যাঁয়ে
লেকিন
তুহে নেহি যাঁয়ু
ও সজনা তুহে নেহি যাঁয়ু
মুঝে ছোড়কে।

রুক্মিণীর লাস্যময় নৃত্য—সারেঙ্গীতে বেহাগের সুরসঞ্চার তবলার ত্রিতালে তেহাই পায়েলের রিমঝিম, আতরের গন্ধে ভরা, বাবুদের অধৈর্য হাতছানিময় মজলিশ শেষ হয়। এইভাবে এক একটি রাত্রিতে ক্লান্ত হয় রুক্মিণী বাই। তারপর শূন্য বাসর, শূন্য হৃদয় কেননা যারা ছিল হয়তো আহামরি তারা নয়, কিংবা যে ছিল রাত্রির অতিথী হয়ে সে 'ও' নয়—তবু

সে রাত্রে জীবনের একান্ত জন, রাত্রি শেষে চলে যাবে অন্য কোথাও, রুক্মিণী রয়ে যাবে নিজের মধ্যে একা আবার রাত্রির অপেক্ষায়।

কুন্তল আসে আজকের রুক্মিণী বাইয়ের মনের ভিতরে, সে বলেছিল ফিরে আসবে, সে বলেছিল তাকে বাঁধবে সংসারের বাঁধনে আসেনি সে, কিংবা আসলে ও জানতে পারবে না তার নাম, তার ঠিকানা, সে বিদিশা নেই, হারিয়ে গেছে মুজরোর রুক্মিণী বাইয়ের মধ্যে আবার মনে হয় হারিয়েই যদি যায় তাহলে কুন্তল আসে কেন যখন তখন ছবি হয়ে, আর তার সিগারেট খাওয়ার ধরন।

এক একটি রাত্রি সে সহচরী হয় এক একটি বাবুর। মুজরোর শেষে তাদের সাথে কথাবার্তা হয় মালিকের, দাম চুকায় আগে, রুক্মিণীর বাসরে প্রতি রাত্রে ফুলশয্যা হয়, শরীরের প্রতি টানে। রুক্মিণী চেষ্টা করে এড়িয়ে যাওয়ার। মদের পেয়ালা ভর্তি হয় খালি হয়। আবার ভর্তি আবার খালি, নেশায় বিভোর হয় রাত্রের বাবু। রুক্মিণী তো তাই চায় তারপর ঘুমিয়ে যায়, শরীরে শ্রেষ্ঠ উত্তাপ নেওয়ার আগেই। ঘুমায় না রুক্মিণী জেগে থাকে সমস্ত রাত্রি, জীবন যন্ত্রণা, জীবনের প্রতি ঘৃণা নিয়ে। সে ফিরে যেতে চায় কলকাতায়, যেখানে জীবন কেটেছে তার মা ঝিন্দনের, যেখানে আছে কুন্তল। কিন্তু কিভাবে সেই ভাবনায় কাটে এক একটি দিন।

সেদিন রাত্রিতে মুজরো শেষে নীহার রঞ্জন বাবু নামে এক বাবু রাত্রির অতিথী হয়েছিল রুক্মিণী বাইয়ের বাসরে। কেন কে জানে শারীরীক নেশার বদলে গল্প করেই কাটিয়ে দিল সমস্ত রাত্রি। পান পেয়ালা তাকে যেমন টানছিল তেমন টানেনি রুক্মিণীর প্রায় নগ্ন শরীর। রুক্মিণীর জীবনের ইতিহাস জানতে চাইছিল নীহার বাবু। সব শোনার পর জিজ্ঞাসা করেছিল তুমি কলকাতায় ফিরে যাবে?

রুক্মিণী বলেছিল—ইচ্ছে তো যায়, কিন্তু কিভাবে, তাছাড়া এরা কি ছাড়বে, যদি ছাড়েও কোথায় যাবো।

নীহার বাবু বলেছিলেন—তোমার মায়ের মুজরোয়।

তারা কি নেবে?

তোমাকে দেখে না বলার ক্ষমতা তাদের নেই।

আর কুন্তল, দেখ তাকে খুঁজে পাও কিনা!

একদিন ভোরে সবাই জানলো রুক্মিণী বাই কোথায় চলে গেছে। গোটা বেনারস খুঁজেও তাকে পাওয়া যায়নি।

নীহার বাবু কলকাতার বেশ্যাপটি সংলগ্ন মুজরোতে মাঝে মাঝে যায়, সবাই তাকে সম্মান দেয়, সবাই তাকে ভালবাসে। পরে রুক্মিণী শুনেছে সে ঐসব জায়গায় যায় নারী সহবাসে নয়, তার জীবন যন্ত্রণায় ওদের সাথে বসে সমস্ত রাত্রি গল্প করতে, সেই সব

অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্প বই লিখে তা প্রকাশ করাই তার নেশা, তার একমাত্র সন্তান মারা যাওয়ার পর এবং স্ত্রী বিয়োগের পর জীবনটাকে এইভাবেই কাটিয়ে দিতে চায় নীহার বাবু।

সেই নীহার বাবু রুক্মিণীকে আবার ফিরিয়ে এনেছে সাদা তিনতলা বাড়ীতে, যেখানে মুজরো বসে কিন্তু সে সুর নেই, পায়েলের ঝঙ্কারে স্বর্গীয় মাদকতা নেই আছে কেবল চটুল সঙ্গীতময় শরীরের লাস্য, আর সব সমর্পণের ঈশারা, নেই সেইসব সম্ভ্রান্ত বাবুরা, যারা আসে তারা যেন নাচ গানের থেকে কত দ্রুত শরীরটা পাওয়া যায় এবং তাকে নিয়ে শেষ্ঠ উল্লাস সেরে কি করে পালানো যায় সেই ধান্ধাতেই।

আবার অন্য মাত্রা আনে রুক্মিণী—বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া সে মুজরোতে আসে না, নীহার বাবুর অনুরোধে এবং রুক্মিণীর প্রতি অঢেল প্রশংসায় রুক্মিণীর দাম অনেক বেশী।

সেদিন মুজরো ছিল রুক্মিণীর, নীহার বাবু ছিলেন অন্যান্য অতিথীদের সাথে, রয়ে গেলেন তিনি সমস্ত রাত্রি। গান শুনেছেন রুক্মিণীর গলা থেকে।

তখন রাত্রি শেষ। ভোরের সুরের মাতন উন্মুক্ত বাতাসে। নীহার বাবুও চলে গেছেন, বিষাদ বসন্তে একা রুক্মিণী আর তার দীর্ঘশ্বাস। সে দীর্ঘশ্বাস তারই হৃদয়ে ধাক্কা খেয়ে ছড়িয়ে যায় তার ঘরে, যেখানে একটু আগে ছিলেন নীহার বাবু চাওয়া পাওয়া হীন একান্ত স্বজনের মত। আর তার ফেলে যাওয়া কয়েকটা সিগারেটের শেষ অংশ এবং বিশ্বস্ত সারেঙ্গীটা। রুক্মিণী জেনে গেছে তার ছাব্বিশ বৎসরের জীবনে—ভালবাসা বলে কিছু নেই, ভাল বাসতে নেই কাউকে, ভালবাসার দাম দেয় না কেউ। কেবল স্বার্থপরতা, ভোগ বিলাস সেরে শুকনো ফুলের মালার মত পরিত্যাগ করে সবাই চলে যায় নতুন টাটকা মালার সন্ধানে আর বাইজী হিসেবে প্রতি রাত্রে চোলি ঘাঘরায় আসে শিহরণ কারও না কারও অপেক্ষায়।

সে যেন শুনতে পায় গঙ্গার বয়ে যাওয়ার শব্দ, সে যেন দেখতে পায় পূণ্যশলীলায় স্নান সেরে সমস্ত কলঙ্ক গঙ্গার বুকে সমর্পণ করে মানুষ হয়ে যায় সম্ভ্রান্ত মানুষ। গঙ্গার সুরলহরী যেমন ছিল তেমনই সুর তুলে বয়ে যায় তার জন্মলগ্ন থেকে।

সেদিন সেজেছে যেন নতুন করে তিনতলা বাড়ীটি, নিয়নের মাদলসা দেওয়ালে দেওয়ালে। কত যে গাড়ী জমেছে তার তলায়। তারা যেন নতজানু হয়ে সম্মান জানাচ্ছে লাস্যময় বাড়ীটিকে।

রুক্মিণী সেজেছে—চোলি ঘাঘরায়, গলায় মুক্তোর হারে নিয়নের আলো পড়ে যেন আরও সুন্দরী করেছে তাকে। অনামীকায় মুক্তোর আংটি, পায়ে পায়েল।

এসেছেন কলকাতার সুবিখ্যাত একটি মানুষ তার সাথে তার বন্ধুরা, সমস্ত রাত চলবে জলসা, মূল আকর্ষণ নাকি বেনারস থেকে আসা শ্রেষ্ঠ সুন্দরী লাস্যময়ী নর্ত্তকী গায়ীকা রুক্মিণী বাই।

নীল আলো জ্বলল মুজরোয়। সারেঙ্গীতে ঝঙ্কার উঠল আপন খেয়ালী সুরে, তবলচি চাটি দিল তবলায়—সবার চোখ রুক্মিণীর আসার পথে।

তখন সুরার পেয়ালায় প্রেমের কামনায়—

রুক্মিণী মুজরোয় বসন্ত ওদের মনে, সুরা সারেঙ্গী সঙ্গীত যে জলসার জগৎ শরীর সমাহারে।

তবলচি ত্রিতালের গত কায়দা শেষ করে তেহাই দিতেই গানে ভাসায় রুক্মিণী।

বালমা মুঝে ঘর আয়ে সজ্‌না
ক্যায়সে গ্যায়ে থে
মুঝে ছোড়কে
ফিরভি আয়ে তো
মেরি পাশ রহ্‌না
আজ সারি রাত
মেরি দিল নেহি চাহে
তুঝে ছোড়না,
বালমা মুঝে ঘর আয়ে সজ্‌না।

কুন্তলকে চিনতে ভুল করেনি রুক্মিণী তার সিগারেট খাওয়ার কায়দা, তার কপালের ডান দিকে কাটা দাগ, কুন্তল রায় যার সাথে বেনারসের সেই লজে পঞ্চম দিনে অঙ্গীকার করেছিল, সেই মানুষটি কলকাতার বিখ্যাত মানুষ। আর তার বিদিশা দীর্ঘ দশ বৎসর পরে রুক্মিণী বাই হয়ে তার কামনার আগুনে জ্বলে যাওয়ার আগে তার শরীরময় শিহরণ জাগাচ্ছে এই মুজরোতে।

থেমে গেছে সারেঙ্গীর সুর, শেষ হয়েছে বসন্ত বাহার অঢেল টাকা নতজানু রুক্মিণীর পায়ের তলায়, তার সান্নিধ্যের জন্য বাবুরা নতজানু, কুন্তল সুরার আতিশয্যে যেন উঠতে পারছেনা। তার হাতে সোনার হার মুক্তাখচিত, দিতে চায় রুক্মিণীর গলায়, কেননা দুজনেই আজ মজলিসের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু সমান্তরালে অবস্থানকারী। সে সম্ভোগ করবে রুক্মিণী বাইকে সমস্ত রাত্রি, আর রুক্মিণী বাই ফিরে যাবে দশ বৎসর আগে তার কুন্তলের কাছে বিদিশা হয়ে।

সবাই চলে গেছে, মুজরোতে অন্ধকার, বিদিশার তিনতলার মহলে কুন্তল—বিদিশা—দুজনেই একটার পর একটা ভর্তি পেয়ালা শেষ করছে, দুজনেই হাসছে দুজনের শরীরের অনিঃশ্বেষ শীত—কারে।

তারপর নিজেকে উৎসর্গ করেছে বিদিশা কুন্তলের কাছে, কুন্তল শেষ করেছে লঘুমুহূর্তের উল্লাস।

কারও চোখে ঘুম নেই, একসময় বিদিশা কুন্তলকে বলে—আপনার বিদিশাকে মনে পড়ে?

কুন্তল যেন চমকে যায়, তার নেশার পারদ নামতে থাকে একটু একটু করে। সে আরও মদ চায় আবার বলে চাই না।

তারপর জিজ্ঞাসা করে—বিদিশা নায়েক?

বিদিশা বলে—হ্যাঁ।

আজও মনে পড়ে, যার স্মৃতি বয়ে বেড়াই আজও এই দশ বৎসর পরেও।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বিদিশা। আপনার ছেলে মেয়ে কজন। আপনার স্ত্রী তিনি নিশ্চয় ততখানি ভালবাসে না। কেননা এখানে যারা আসে তাদের অনেকেই সংঘাতময় জীবন যাপনে বিরক্ত, নিঃস্ব হয়ে তবে তো আসে, অবশ্য কেউ কেউ নেশায় আসে, আপনার আসার কারণ যদি জানতে পারতাম খুব ভাল লাগত, তাছাড়া এই মুজরোতে আমি এসেছি কয়েক মাস মাত্র। আপনাকে প্রথম দেখলাম তো।

কুন্তলের চোখ বিদিশার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে।

তারপর বলে—বিদিশা হারিয়ে গেছে। তাকে খুঁজেছি বহুবার। বলতে পারে নি কেউ সে কোথায়, ব্যর্থতার গ্লানি, না পাওয়ার বেদনায় আজও বিয়ে করা হয়ে উঠেনি আমার।

বিদিশা কোথায় কেন হারলো জানেন না?

না।

তাকে ভালবাসতেন তাই না?

জীবনে যে প্রথম ভালবেসে আমাকে উৎসর্গ করেছিল তার সবকিছু, যাকে কথা দিয়েছিলাম জীবনের সাথী করে নেব তারপরেও প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করা বৃথা নয় কি?

ভোরের গাড়ীগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে হর্ণ দিতে দিতে। তিলোত্তমা কলকাতায় শুরু হচ্ছে মানুষের জীবনের সুর। সে সুর ভ্রাম্যমাণ হবে নিজের মত করে জীবন জুয়ার মতো।

গঙ্গা বয়ে চলে বিশ্রামহীন, আসরফি উড়বে ব্যবসা স্থলে, বাইজীর ঘরে।

সন্ধ্যা হবে, রাত্রি বাড়বে—শরীর নিজেকে প্রশ্ন করবে "তুমি কার" নিজেই উত্তর দেবে নবাবী দিল যার আমি তার, ক্ষণিক উন্মত্ত জীবনের প্রিয় বিশ্রামাগার।

তারপর চোলি ঘাঘরায় শিহরণ আসবে, পায়েলের মনে আসবে মাদলসা, সারেঙ্গীতে ঝড় তুলবে বসন্ত।

শেষ হবে সব। সারেঙ্গী বাজবে অন্যতমা বেহাগে, রুক্মিণী বাইয়ের গলায় ভাসবে—

আগর কোই থে তো
ওহ্ সজনা মেরে ঘর আয়ে
ঢুঁডতি হ্যয় দশ সালো সে

তব নেহি আয়ে-মেরে সজনা,

জো আজ আয়ে

কিঁউ আয়ে

উস দিন সে কিঁউ নেহি আয়ে।

কুন্তল চলে গেছে বিদিশাকে ছেড়ে, আবার আসবে কথা দিয়ে, সেদিনও বলেছিল আসবে।

সে চিনতে পারেনি রুক্মিণীর ভিতরে রয়েছে বিদিশা, ধরা দিতেও চায়নি বিদিশা, কি লাভ ধরা দিয়ে।

সে যে এখন বাইজী রুক্মিণী বাই—

সে চায় কুন্তল আসুক প্রতিদিন তার বিদিশার কাছে যাকে উৎসর্গ করার কথা ছিল স্ত্রী হিসেবে—

তাকে উৎসর্গ করে যাবে বেনারসের বাইজী রুক্মিণী বাই হিসেবে,

হয়তো সারেঙ্গীতে বসন্ত আসবে না—

বেহাগ ভর করবে তার তারে—তবুও!

প্রতীচির ঝড়

ঈশান কোণ থেকে ভেসে আসা খন্ড খন্ড কালো মেঘ একত্রিত হয়ে নীল আকাশের সৌন্দর্যটাকে বেআব্রু করে দিচ্ছে। এবার একটা ঝড় উঠবে।

ঝড় উঠেছে, দোল খাচ্ছে রাস্তার দুধারে ইউক্যালিপ্টাস, মনে হচ্ছে যেন এক্ষুণি ভেঙে পড়ে যাবে রাস্তার উপরে। কাছাকাছি কোন বাড়ী ঘর নেই। সেই রাস্তা দিয়ে চলেছে যেন উদ্‌ভ্রান্ত পথিক। কাঁধে সাদা শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, ব্যাগে কিছু লিফলেট, দরকারী কাগজপত্র, বাতাস ঢুকছে সেই ব্যাগে, উড়িয়ে দিচ্ছে লিফলেট আর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ঘুড়ির মত পাক খেতে খেতে তারা উড়ে যাচ্ছে কোথায় কে জানে। পথিকের পথ চলায় আত্মবিশ্বাসের দেউলেপনা, আজকের রাজনীতির মত। পথিকের আশেপাশে কেউ নেই, গাছগুলো ছাড়া।

পথিকের নাম কামারুল।

জীবনের এক একটি যুদ্ধ যেখানে সমাজ, অর্থ, রাজনীতি এমন কি তার তালাক দেওয়া স্ত্রী—এখন যে তার ভাইয়ের স্ত্রী সবাই প্রতিপক্ষ, তাদের বিরুদ্ধে লড়ে চলেছে সে একা।

কামারুল বাংলায় এম. এ. করেছে বিরানব্বই সালে। ভাল ছাত্র, ভাল বাগ্মী, সুদর্শন, লেখাজোখায় বেশ মুন্সিয়ানা।

তার চেহারায় কিছুটা আফগানদের চাকচিক্য, সাজানো চাপ দাঁড়ি দার্শনিকের মত। তাকে দেখে মেহের প্রেমে পড়ে সাদী করেছিল। নাম তার মেহেরুন্নিসা অপূর্বা সুন্দরী ইংরেজীতে বি. এ. পাস।

ইউনিভার্সিটিতে কামারুলের হিন্দু বন্ধুই বেশী। সৌরভ তাদের অন্যতম সে ছিল তার বন্ধু, তার ভাই এর মত। কামারুল যখন ফাইনাল ইয়ার সৌরভ তখন First Part.

বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র জন্মোৎসব, ধুমধাম আয়োজন। বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা আসবেন, আসবেন নামকরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা, সমগ্র অনুষ্ঠানের দায়ীত্বে কামারুল, তার সহকারী হিসেবে সৌরভ।

অনুষ্ঠান শুরু হল। উপাচার্য ঘোষণা করলেন আজকের রবীন্দ্র জন্মোৎসবে পরিচালনার দায়ীত্বে থাকছে ফাইনাল ইয়ারের আমাদের প্রিয় ছাত্র তোমাদের সবার প্রিয় কামারুল হুসেন। সাহায্যকারী হিসেবে এবং একই সঙ্গে সঞ্চালক হিসেবে থাকছে—তোমাদের কাছের মানুষ সৌরভ—অর্থাৎ সৌরভ রায়।

সৌরভ মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে সুইচ অন করল, তারপর বলল—আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পেয়ে আমি গর্বিত শুধু নয় আপ্লুত। যারা এই গুরুভার

আমার হাতে দিয়েছেন বা দিয়েছে শুরুতে তাদের ধন্যবাদ, যারা প্রণম্য তাদের প্রণাম, যারা বন্ধুবর তাদের অভিনন্দন, যারা আমার ছোট তাদের স্নেহাশীষ জানালাম। আজ পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, যিনি ভারতগৌরব, যিনি বিশ্ববন্দিত, যিনি সবার হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে বসে আছেন, বসে থাকবেন পৃথিবী যতদিন তার অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকবে। এখন অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী সুকণ্ঠি গায়িকা আমার দিদি স্বাগতা ব্যানার্জী—আপনারা তার কণ্ঠে শুনুন। ধনিল হে গানখানি—যে গানে উদাত্ত আহ্বান ক্লান্ত, শ্রান্ত, ব্যস্ত, মানুষের প্রতি আজ এই পঁচিশে বৈশাখে সৃজনের অঙ্গীকার নিতে হবে বলে।

সকালের প্রাথমিক পর্ব শেষ হল, মধ্যাহ্নকালীণ অবসরের পর শুরু হল বৈকালিক অনুষ্ঠান। সৌরভ ঘোষণা করল—সমাজ গড়ার ডাক এসেছে, ভেঙে ফেলতে হবে বিভেদের প্রাচীর, ভেঙে ফেলতে হবে বন্ধ দূয়ারের চাবি যার এপারে ওপারে ধর্মের বিভাজনে মানুষের কান্না, তারা উন্মুখ তাকিয়ে মিলনের প্রত্যাশায় তারুই আঙ্গীকে "আফ্রিকা" কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন আজকের অনুষ্ঠানের পরিচালক আমাদের সবার প্রিয়তম কামারুল দা—কামারুল হুসেন।

দরাজ ভারিক্কী গলায় কবিতার প্রত্যেকটি অভিঘাৎ যেন সে সেদিনেরই বিপ্লবী—এইভাবে আবৃত্তি করল কামারুল হুসেন। সৌরভ মুগ্ধ, মুগ্ধ উপস্থিত সবাই। যেন একনিষ্ঠ স্তব্ধতার মধ্যে থেকে এক একটি শিকল ভাঙছে কামারুল, উদ্দীপ্ত হচ্ছে সবাই, তাদের চোখে মুখে তারই অভিব্যক্তি। শেষ হল—তবু যেন শেষ নেই, সৌরভ ঘোষণা করল—"ধন্যবাদ কামারুলদা, আমরা অভিভূত"— তখনই করতালিতে যেন ভেঙে পড়ল প্রাচীর।

আর কামারুল—সৌরভের হাত থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে বলল আমি জানিনা সবার মন জয় করতে পেরেছি কিনা যদি পেরে থাকি তাহলে তার পূর্ণ দায় সৌরভের শুরুর আগের বক্তব্যের উদ্দীপনায়।

সৌরভ, কামারুল, দুজনের বাড়ী যেন দুই মেরুতে। সৌরভ কাঁথি, কামারুল মুর্শিদাবাদ। ইউনিভার্সিটি শেষ করে তাদের যোগাযোগ সূত্র মাসান্তে একটি করে চিঠি। সে চিঠিতে শুভেচ্ছা বিনিময়, বাড়ীর সবার খোঁজখবর আর হতাশার চালচিত্র।

সৌরভ একবার কামারুলকে লিখেছিল দেশটা ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ, নজরুল ইসলামের ভারতবর্ষ অথচ সুকান্ত জন্ম নিল, জন্ম নিল এক টুকরো রুটির জন্য লড়াই, বেকারত্ব ক্রমবর্দ্ধমান, অথচ ইস্তাহারের পর ইস্তাহার কর্মসংস্থান, কর্মসংস্থান, কর্মসংস্থান। সেই আকর্ষণে বেকারদের মরা নদীতে জোয়ার তারপর ভেসে যাওয়া সেখানে ভোট নামক বৈতরণী শেষ হলে আবার ভুলে যাওয়া। এ যেন ভাঁওতাবাজীর ভারতবর্ষ।

কামারুল চেষ্টা করেছে। চাকরী কোথাও নেই, পি এস সি তে কোয়ালিফাই করেছে।

মৌখিকে দাদা ধরা, সে অভ্যাসে রপ্ত নয় বলে ফিরে এসেছে একরাশ হতাশাকে বুকে বেঁধে নিয়ে। তারপর আর চেষ্টা করেনি।

তখন পশ্চিমবঙ্গে চলছে একটা রাজনৈতিক ডামাডোল, বিরোধী পক্ষ ভীষণভাবে সরব। যে কোন মুহূর্তে উঠতে পারে ঝড়, উড়ে যেতে পারে পুরানো যা কিছু, কোথাও কোথাও রক্তক্ষয় হচ্ছে অযথা, কিন্তু সে ঝড় উঠেনি, উৎসস্থলের দুর্বলতায় নিম্নচাপ হালকা হতে হতে সমুদ্রের মাঝখানেই সমাহীত হয়ে গেছে, আর এগিয়ে আসতে পারেনি, একটু আধটু ঝোড়ো বাতাস ছাড়া।

কামারুল গ্রামেই থাকে, মাঝে মাঝে কোন কোন অনুষ্ঠানে যায়। কিছু রোজগারও হয়। সে পত্রপত্রিকায় লেখাজোখা করে, এইভাবেই নিজের এলাকায় অর্জন করতে থাকে একটু একটু করে সুনাম। তাকে এলাকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদরা অনুরোধ করে বেকার সময়টুকু অপচয় না করে পার্টিতে সময় দেওয়ার জন্য। কি করবে সিদ্ধান্তে আসতে পারে না কামারুল। তার দেখেশুনে মনে হয় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় এলে তার শিক্ষার দাম হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে ব্যক্তিগত মতামত পোষণের স্বাধীনতা, সৌরভের কথা তার মনে পড়ে। কামারুল সৌরভকে চিঠি দেয়—

প্রিয় সৌরভ,

আশা করি ভাল আছিস্। আমি খুব একটা ভাল নেই। বেকারত্ব যেন কুরে কুরে খাচ্ছে প্রতিমুহূর্ত। তার উপর একটা পারিপার্শ্বিক চাপ যেখানে পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ আমার শিক্ষা, আমার চেতনা অপরের হাতে সমর্পণ করে কেবল অনুসরণকারি হয়ে যাওয়া, বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নিলে হয়তো নিজের সৃষ্ট আগুনে নিজেকেই আহুতি দেওযা, কি করব ভাবতে পারছিনা। যদি তোর মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাকে একটা সিদ্ধান্তের জায়গায় এনে দিতে পারিস উপকৃত হব। যাই হোক মাসীমা মেসোমশায় কেমন আছেন। তোর বিয়ের কি হল জানাবি, গুরুজনদের আমার আদাব জানাবি,

ইতি তোর কামারুলদা

চিঠি পেয়েছিল সৌরভ প্রত্যুত্তরে লিখেছিল—

প্রিয় কামারুলদা,

আশাকরি তুমি ভালই আছ, আমি বা আমরা সবাই ভাল আছি। যখন দেখলাম সামনে পিছনে শুধু অন্ধকার, তার সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক ভূতের ভয় আমার ঘুমের ব্যাঘাৎ ঘটাচ্ছে প্রতিমুহূর্ত, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বেকারত্ব কাটবে না কখনও, তার থেকে রাজার অনুগতপূজা হয়ে সুখে দিনাতিপাত করার থেকে সুখ অন্য কোথাও নেই। শুনে খুশী হবে কিনা জানি না তোমার সেরা সৌরভ এম. এ. বাংলা ভোটে পঞ্চায়েত হয়ে জনসেবায় নিযুক্ত হয়েছে। আরও অবাক হবে যে আমি লেখালেখি ছেড়ে দিয়ে দেশের দশের কাজে

মনোনিবেশ করেছি। এবার আরও দায়ীত্ব বাড়বে। তার সাথে যদি অন্য সব বাড়ে মন্দ কি! তুমি দেরী করোনা আমার একান্ত অনুরোধ,

ইতি তোমার

সেরা সৌরভ

সিদ্ধান্ত নিতে আর দেরী করেনি কামারুল, নিজের সৃষ্ট আগুনে নিজেকে আহুতি দিয়ে দহন যন্ত্রণার থেকে মুক্তি পাওয়াই সৌরভের কথা অনুযায়ী সঠিক পথ, এখন সে কমরেড কামারুল হুসেন।

কামারুল সৌরভকে মাঝে মাঝেই বলত বাস্তববাদী। কাঁথির ছেলেরা অবশ্য সত্যিই বাস্তববাদী তানাহলে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের এমন কোন সরকারী কার্যালয় নেই যার প্রতি দশটির মধ্যে একটিতে অন্তত কাঁথির ছেলে পাওয়া যাবে না এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার ওরা যত সুন্দরভাবে করতে পারে অন্যরা তা পারে না।

শুধু ছেলেরাই কেন মেয়েরাও ভীষণ রকমের বাস্তববাদী, তারা কেবল আবেগে গা ভাষায় না অথবা ভবিষ্যতের চিন্তা না করে কোন ঝুঁকিও নেয় না।

কামারুল তার প্রমাণও পেয়েছে, যখন সে এম. এ. তে ভর্ত্তি হয়, কাঁথির একটি মেয়ে নাম তার চৈতালী-চৈতালী মাইতি, সে পড়ে মেদিনীপুর কলেজে ইংরেজী অনার্স নিয়ে তৃতীয় বর্ষে। ক্ষুদিরাম নগরে একটি মেয়েদের মেসে থাকে। আর কামারুল সৌরভরা থাকে হাঁসপুকুরে। কামারুলের আসাযাওয়ার পথে প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়। সেখান থেকে পরিচয়, তারপর অন্তরঙ্গতা, অন্তরঙ্গতা থেকে পূর্বরাগ তারপর প্রেমালাপ, না চৈতালী খুব একটা সুন্দরী ছিল না কিন্তু স্মার্ট, বুদ্ধি দীপ্তা ছিল, চৈতালী প্রতি রবিবার যেত কামারুলের বাসায়, সেখানে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প, কোনোদিন সৌরভের উপস্থিতিতে, কোনদিন সৌরভ থাকত না, কামারুল চৈতালী মাঝে মাঝে সিনেমায় যেত অরোরা, মহুয়া, হরিতে কোন কোন ছুটির দিন কাঁসাই এর ধারে যেত যা কিছু খরচ সবই করত কামারুল। কামারুল পড়ার সাথে সাথে কিছু টিউশনও করত রোজগার হত সেখান থেকেই।

সেদিন বুধবার, ছুটির দিন। সৌরভ কাঁথি গেছে। বাসায় আর যে একজন সেও গেছে তার বাড়ী। একা কামারুল সন্ধ্যায় এসেছে চৈতালী। ঘনিষ্ঠতার পূর্বপর্যায়েই দুম করে বলে বসল কামারুলদা কয়েকদিন থেকে একটা কথা তোমাকে বলব বলব ভাবছি..........

কামারুল—বল তো বলে ফেল না, আর দেরী কেন?

আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, কেননা কোন শারীরিক সম্পর্ক শুরুর আগে পরস্পর পরস্পরের বৈধ সম্পর্ক স্থাপন না করলে সমাজ অন্যভাবে নেবে। তাছাড়া আমিও চাইনা অবৈধতার আশঙ্কাজনিত দোলায় দোদুল্যমান হয়ে থাকতে।

আমি মুসলিম, তোমার সেটা না জানার কথা নয়। তাছাড়া তোমার সাথে এমন কোন গভীর সম্পর্ক এখনও তৈরী হয়নি—যে এক্ষুণি সব ভেবে নিতে হবে।

আমার বাবার যা আছে তোমাকে এখানেই প্রতিষ্ঠিত করে দেবে, তোমাকে কোনদিন ফিরে যেতে হবে না মুর্শিদাবাদে।

তুমি বুঝতে চাইছনা আমি কে বলতে চাইছি।

তোমার সমাজে ফিরে না গেলে সবাই মেনে নেবে।

আমি তো নিয়েইছি। তুমি চাইলে তোমার যদি চাকরী হয় বাবা বহু টাকা দেবে।

তোমার বাবা জানেন?

হয়তো জানে না, তবে আমি বলব, যেহেতু আমি বাবার একমাত্র মেয়ে সে রাজী হয়ে যাবে।

দেখ চৈতালী তুমি আজ যেসব বলছ, সবই আবেগে ভেসে যাওয়ার স্বপ্ন বিভোরতায়। তোমার দোষ বা গুণ সেসব বলছি না।

কিন্তু বাস্তব ভীষণ কঠিন। তখন দেখা যাবে আমাকে ভালবাসা উপহার দেওয়ার বদলে কেবল চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া তোমার দেওয়ার কিছু থাকবে না।

আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি।

কিন্তু পরিণতি যে ভয়াবহ, তোমার কথা ভেবেই বলছি তোমার প্রস্তাবে রাজী হওয়া মনে হয় আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি এখন যে পর্যন্ত এসেছ সেখানেই থেমে যাও, কেবল বন্ধুত্বটুকু নিয়ে ফিরে যাও তোমার বলয়ে।

কামারুল দেখেছিল চৈতালীর চোখে জল। সে যেন এক আকাশ অভিমান নিয়ে চলে যাচ্ছে বাসা থেকে, আর কখনও ফিরে আসেনি।

চেতনা থেকে জেনেছিল চৈতালী জীবনের বন্ধনকে নিশ্চিন্ত করতে হয়, তারপর সবকিছু, যদিও তার ভাবনা ছিল সবচেয়ে বড় ভুলে ভরা তবুও।

নিশ্চিন্ত হয়েছিল কামারুল।

সৌরভও তেমনই বাস্তববাদী—সে জানে বেকারত্ব অভিশাপ, তার থেকে মুক্তি সে তো কন্টকাকীর্ণ। "যেখানে যতেক ছাই উড়াইয়া দেখ তাই পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন" ভাবনায় সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং সেই ভাবনা থেকেই সময় অপচয় না করে সুগম্য পথের দিশায় যারা দিশারী হাত মিলিয়েছিল তাদের সাথে রাজার অনুগত প্রজা হয়ে।

সৌরভের দেওয়া মতামতেই কামারুল আজ কমরেড কামারুল। সে সবারই সাথী দেশের দশের সেবায় নিবেদিত প্রাণ, সে সভা সমিতিতে বাগ্মী, ঝামেলায় সবার আগে, মিমাংসায় তার মতামত সর্বজনগ্রাহ্য। মন জয় করছে একে একে সবার, তার শিক্ষা তার

সততায় মুগ্ধ হচ্ছে সমগ্র জনগণ, নেতৃত্ব। সে দেখছে ক্রমশ উত্তরণের আলোকশিখা, ভুলে যাচ্ছে যদিও ধীরে ধীরে, দ্বন্দের মধ্য দিয়ে তার অতীত।

এক সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মহিলা সমিতি পরিচালিত, সে প্রধান অতিথি, পরিচয় হয়েছিল মেহেরুন্নিসা নামে মেয়েটির সাথে, যদিও আরও অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছিল। তার মনে দাগ কেটেছিল সেই মেয়েটি। পরিচয় পর্বে জেনেছিল সে ইংরেজীতে বি. এ. করে তার আব্বার ঐতিহ্য অনুযায়ী যুক্ত হয়েছিল মহিলা সংগঠনের সাথে। সেই ফুলের স্তবক দিয়ে বরণ করেছিল কম্ কামারুল হুসেনকে, তার মাঝে মাঝে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা হত সেই দেখা থেকে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা। তারপর প্রণয় পর্ব। মেহেরুন্নিসার আব্বার ইচ্ছে এবং পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের আয়োজনে ধুমধাম করে সাদী হয়েছিল কামারুল মেহেরুন্নিসার।

কামারুল ভুলে যায় নি সৌরভকে। নিমন্ত্রীত হয়েছিল সে, সৌরভ তখন ধীরে ধীরে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমন্ত্রণ রক্ষা করতে কাঁথি থেকে মুর্শিদাবাদ গেছে পার্টিরই খরচে। তখনও তার বিয়ে করার ফুরসুৎ হয়নি।

কামারুল সৌরভকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে মেহেরুন্নিসার সাথে। সৌরভ সম্বোধন করেছে মেহেরুন্নিসাকে ভাবি বলে, হৈ হুল্লোড় করে কাটিয়েছে চার পাঁচদিন, তারপর ফিরে এসেছে কাঁথিতে।

কামারুল মেহেরুন্নিসাকে মেহের বলত। মেহের কামারুলকে আপন করে পেয়ে ধন্য হচ্ছিল প্রতিদিন আর কামারুল মেহেরের আদর যত্ন, তার ভালবাসায় এবং তার প্রতি আনুগত্যে দিনকে দিন অবাক এবং আপ্লুত হচ্ছিল।

মেহেরের ভালবাসাকে পাথেয় করে নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়েছে কামারুল সামনে একটা ভোট, তার দায়িত্ব দু তিনটি জোনে। সে যেন যন্ত্রদানব! বিশ্রাম নেই, ক্লান্তি নেই, ছুটে চলেছে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। জনসভা, স্ট্রীট কর্ণার, পার্টি তার ধ্যানজ্ঞান। আর এক মেহেরের মতই।

মেহের হয়ে গেছে আদর্শ ঘরণী। মহিলা সমিতিতে আর তেমন যেতে পারে না, তার বাড়ীতে শশুর, শাশুড়ী তারা বয়োবৃদ্ধ, তাছাড়া পাঁচ সাতটা বিনে পারিশ্রমিকের টিউশান—কামারুলই ঠিক করে দিয়েছিল। সুতরাং সময় কোথা। ওরা ছাড়াও আছে সাধের দেওর শহিদুল। মাঝে মধ্যে ছুটি পেয়ে এসে প্রতিমুহূর্তে ভাবি ভাবি আর ভাবি।

মেহের শহিদুলকেযখন তখন বলত আর তোমাকে নিয়ে পারি না। এবার সাদী কর দেখি বাপু সে তোমার দায় দায়িত্ব নিক।

শহিদুল বলেছিল তোমার মত কাউকে পেলে সাদী করব, নইলে নয়।

মেহের হেসেছিল আচ্ছ্বাসে, তারপর বাড়ীর সবাইকে শহিদুলের কথা বলেছিল। শহিদুল লজ্জা পেয়েছিল। বাড়ীর সবাই মজা পেয়েছিল।

এইভাবেই চলছিল তিনটি বৎসর। মেহের যেন অধৈর্য হয়ে উঠছিল এখনও পর্যন্ত সে আম্মা ডাক শুনতে পায়নি বলে।

মনে তৈরী হচ্ছিল এক একটি আশঙ্কা সেখান থেকে দানা বাঁধছিল একটু একটু করে ক্ষোভ। কামারুলের ভালবাসা যেন দিনকে দিন যান্ত্রীক হয়ে যাচ্ছিল সময়ের সাথে সাথে, সে আর মেহেরকে আগের মত ভরিয়ে দেয় না, আগের মত বাড়ী ফিরেই মেহের, মেহের করে ডাকে না, অথবা বলে না তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

বহুদিন পরে এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মেহের কামারুলকে বলে আর ভাল লাগছে না এবার একটা বাচ্চা টাচ্চা দরকার।

হয়নি তো কি করা যাবে। তোমার তো দায়িত্ব আছে, ডাক্তার দেখানোর, পরীক্ষা নিরীক্ষা করার। তাছাড়া তুমি যেন আস্তে আস্তে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছো, দেখে মনে হচ্ছে আমাকে তোমার আর ভাল লাগেনা।

বাজে বকবে না তো। আমার সময় কোথায়?

তাহলে সাদী করলে কেন?

আগে কি জানতাম—তোমার শরীরময় রোগ।

এইভাবেই ছোটখাটো বাদানুবাদ, মান অভিমান, প্রত্যাখ্যান সেখান থেকে শুরু হয়েছে একটা ব্যবধানের খাল খনন।

একদিন কামারুলের আম্মা কামারুলকে একই কথা বললে, সে ফিরে আসে মেহেরের কাছে, কৈফিয়ৎ চায় আম্মাকে এর মধ্যে জড়ানোর জন্য, তার থেকে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে শুরু হয় উত্তেজনাময় বাদানুবাদ।

কামারুল বলে বসে—তোমার যদি মনে হয় আমি অক্ষম তো চলে যেতে পারো যেখানে খুশী যার সাথে। খুশী অথবা তোমার ভালবাসার দেওরের সাথে। তোমার বাচ্চা হবে তুমি আম্মা হবে।

মেহের রাগে জ্বলছিল—চিৎকার করে বলেছিল তোমার মনটা দিনকে দিন এত নিচ হয়ে যাচ্ছে যে তোমাকে আমার ভালবাসার পরিবর্তে ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছে।

এভাবেই চলতে চলতে কামারুল হাত তুলেছিল মেহেরের গায়ে।

মেহের আহত বাঘিণীর মত হয়ে উঠে বলেছিল যারা নিজের স্ত্রীকে মর্যাদা দিতে পারেনি, সন্দেহ করে তারা মানুষের মর্যাদা দেবে কি করে—কি করেই বা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অনুশাসনে দেশের সেবা করবে? আমার লজ্জা হয় তুমি শিক্ষিত হয়ে একথা বলতে। অনুতাপ হয় তোমার মত মানুষকে ভালবেসে সাদী করেছি বলে।

সেই যে কামারুল বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে, দীর্ঘদিন আর বাড়ী ফেরেনি। হয়তো অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে, কিংবা মেহেরের প্রতি সন্দেহে অথবা নিজের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকতে। সে পার্টি অফিসেই থাকে, সেখানেই খায়।

দিনকে দিন ভাঙতে থাকে মেহেরের শরীর, হারিয়ে যেতে থাকে তার শরীরময় সবুজের আস্তরন। তার মনে যেন গ্রীষ্মের দুঃস্বপ্নের নদীর হারানো আভিজাত্য অথবা অনাগত বর্ষায় রুক্ষ মাঠ।

শশুর শাশুড়ী সবকিছু দেখে, বুঝতে পারে সবকিছু কেননা তারাও তাদের সময় কাটিয়েছিল আনন্দ, সুখের আতিশয্যে হয়তো মনোমালিন্য ছিল—ছিল না তবু এমন উঁচু প্রাচীর। দেওরও আসেনি বহুদিন যে তার কাছে সবকিছু বলে হালকা করবে নিজেকে।

এভাবেই কেটে যায় দিন, মাস, বৎসর। শহিদুলকে চিঠি দেবে তারও উপায় নেই। কেননা কয়েকবার দেওয়ার পরে তার বন্ধুরা তাকে নিয়ে বেশ খোরাক করেছিল, সে বারণ করেছে চিঠি দিতে।

পরীক্ষা শেষ হয়েছে শহিদুলের, সে প্রাণীবিদ্যায় এম. এস. সি. দিয়েছে। সেখানের পাঠ চুকিয়ে বাড়ী ফিরেছে সে। এসেই চিৎকার করেছে যেমন প্রতিবার করে ভাবি ভাবি বলে। কোন উত্তর না পেয়ে সে তার আম্মাকে জিজ্ঞাসা করলে আম্মা সমস্ত ঘটনা তাকে বলে। আর দেখেছে আম্মার চোখের জল। সে বুঝতে পারে বাড়ীতে একটা প্রলয় হয়ে গেছে। আর ভাবি তার উপস্থিতির খবর পেয়েও নিজের ঘরে শুয়ে আছে নির্লিপ্তের মত।

মেহেরের ঘরে ঢুকে সে দেখতে পায় মেহের নয় যেন মেহেরের কঙ্কাল পড়ে আছে বিছানায়, তার এলো চুল, পরণে কবেকার পুরানো ছেঁড়া শাড়ী।

জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে ভাবি?

মেহের—জানি না।

দাদা আসে নি?

জানি না।

কেন?

তাকেই জিজ্ঞাসা কর।

কতদিন এভাবে চলছে?

তাকেই জিজ্ঞাসা কর।

তুমি কি আমাকে কিছুই বলবে না?

মেহের পাশ ফিরে শহিদুলকে একবার দেখার সৌজন্যটুকুও দেখায়নি। যেন সে শহিদুলকে চেনে না। শহিদুলও যেন চিনতে পারে না তার প্রিয়তমা ভাবিকে।

সেই দিনেই শহিদুল চলে যায় পার্টি অফিস, তাদের বাড়ীর থেকে তিন চার কিলোমিটার দূরে। সেখানে পৌঁছে অফিসের দরজার কাছে গিয়ে সে শুনতে পায় কে যেন অনুরোধ করছে—স্যার এত কোথায় পাব?

কামারুল বলছে—সে বললে তো হবে না। প্রাইমারী চাকরী বলে কথা, মাস ফুরোলেই পাঁচ-ছ হাজার দিয়ে শুরু, তাছাড়া নিয়ম ব্রেক করে আপনাদের কথা ভেবে আমি ব্যাপারটা সুপারিশ করেছি।

ভদ্রলোক বলছেন—স্যার একটু দেখেশুনে বলুন।

ঠিক আছে আপনার কথাই হবে, তবে একটা অনুরোধ আপনার না বলা চলবে না।

ভদ্রলোক বললেন—কি অনুরোধ বলুন?

একটা রঙিন টিভি আপনি অফিসে দিয়ে দেবেন এই আর কি?

ভদ্রলোক বললেন—ঠিক আছে স্যার আপনি যা উপকার করলেন জীবন থাকতে ভুলব না। তাহলে ছেলেকে পাঠিয়ে দিই।

পাঠিয়ে দেন—কিছুদিন কাজ করুক, সব শিখে নিক, কি ঠিক্ বলছি তো।

শহিদুল আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে দরজার সামনে চলে আসে, এসে দেখে বয়স্ক ভদ্রলোক যেন তার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে আছে। নতমস্তকে প্রজারা যেমন রাজার স্তুতি করে এবং রাজা যেমন প্রজাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে বিজয়ী সম্রাটের হাসি হাসে।

শহিদুল কামরুলকে বলে—ভিতরে যাব।

কামারুল যেন অবাক হয়ে যায়, তারপর ধাতস্থ হয়ে বলে—আয় আয় বোস।

কোন ভূমিকা না করেই শহিদুল জিজ্ঞাসা করে কি ব্যাপার শুনলাম তুই দীর্ঘদিন বাড়ী যাসনি?

কামারুল একটু যেন উত্তেজিত —তোর ভাবি নিশ্চয়ই বলেছে। যতসব বাজে মেয়ে কি কুক্ষণে যে ওকে সাদী করেছিলাম।

আমি সে কথা বলতে আসিনি বা শুনতেও আসিনি জানতে খুব আগ্রহ হচ্ছে তুই বাড়ী যাস্‌নি কেন?

শহিদুলের কণ্ঠস্বর যেন কামারুলের চেনা নয়, তার দৃঢ় প্রত্যয়, কথায় ভীষণ তেজ, যেন এক একটি বোমা বিস্ফোরণ।

কামারুল প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করে—তোর ভাবি চায় না আমি এসব করি, সে চায় বাধ্য খসমের মত তার কামিজের তলায় আমি চিরদিন থাকি।

তাই কি?

হ্যাঁ তাই।

কামারুলের মুখ থেকে মেহের কথাটা একবারের জন্যও নিসৃত না হওয়া দেখে শহিদুল দুঃখও পায়, আবার ভীষণ রাগও হয়।

তবু সে বলে—দাদা আমার মনে হয় তোদের মধ্যে কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। অথবা তুই সেই আগের কামারুল হুসেন নেই। যে মেহের বলতে, তাকে মুহূর্ত না দেখলে কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যেত। ধরে নিলাম ভাবি অপরাধী কিন্তু আব্বা, আম্মা—তাদের অপরাধটা জানতে পারি কি?

তারাও তোর ভাবির সঙ্গে পা মিলিয়ে আমার জীবনটাকে দুর্বিসহ করে দিচ্ছে।

তোর কি আব্বা আম্মার প্রতি কোন দায়বদ্ধতা নেই?

নিশ্চয় আছে—তার জন্য তো মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

টাকা! এত টাকা পাচ্ছিস্ কোথায়? তাছাড়া টাকাটাই কি শেষ কথা?

কেন? এবার তুই তো এসে গেছিস্ দায়িত্ব নে, তাছাড়া তোকে এত কৈফিয়ত দেওয়ার সময় বা মানসিকতা আমার নেই। আর একটা কথা শোন্ মেহের যদি বেশী বাড়াবাড়ী করে তাহলে তাকে আমি তালাক দিয়ে দিতে বাধ্য হব।

ব্যাস! তারপর তোর শিক্ষা, তোর আন্দোলন, নারীর অধিকার রক্ষা তারা নাকি বঞ্চিত, অবহেলিত এইসব কি পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে চলে আসবি। নাকি যা বলিস সব চমক!

কথা বাড়াস না শহিদুল—তাহলে সত্যিই তালাক দেব।

শহিদুল ফিরে চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরে এসে কামরুলের হাতে একটা খোলা খাম সমেত চিঠি দিয়ে সে চলে যায়।

কামরুল চিঠির ভাঁজ খুলে দ্যাখে সৌরভের চিঠি। লেখা আছে—

প্রিয় কামরুলদা

আশা করি তুমি, মাসীমা, মেসোমশায় ভালই আছ বা আছেন। শহিদুল চিঠি দিয়েছিল তার দু তিন মাস পরে এম. এস. সি. ফাইনাল পরীক্ষা সে জোর কদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে। খুব ভাল লাগল। দাদার ভাইতো! ভাবিও কয়েক দিন আগে একটা চিঠি দিয়েছিল।

এত ব্যস্ত হয়ে গেছি যে তোমাদের ওখানে যাব যাব করেও যাওয়া হয়ে উঠেনি। তোমার ভাবি ভাল আছে।

আসল কথায় আসি আমার পুত্র সৌরাশীষের আগামী বৈশাখের দশ তারিখে অন্নপ্রাসন, তুমি ভাবি অবশ্যই আসবে আমরা অপেক্ষায় থাকব। আমি তোমাকে প্রায় দশটা চিঠি দিয়েছি একটারও উত্তর পায় নি! ভাবিও তেমন কিছু লেখেনি। শুধু লিখেছে—আমাকে যাওয়ার জন্য অনেক কথা আছে। ভাবিকে বলো যেন অবশ্যই আসে কথাগুলো এখানেই সারা হয়ে যাবে। আমি বুঝতে পারছিনা আবার কি হল চিঠিতে এত জিজ্ঞাসার চিহ্ন কেন?

যাই হোক তোমাকে বলা; যদি কিছু হয়ে থাকে মিটিয়ে নিয়ো, বাড়ীতে শান্তি থাকলে তবে অপরকে শান্তির দিশা দেওয়া যায়

ইতি তোমার
সেরা সৌরভ

চিঠিতে তারিখ দেওয়া আছে ২০শে চৈত্র আজ ২৩শে জৈষ্ঠ, তার মানে প্রায় দু মাস আগের।

কামারুল সেদিনই বাড়ী এসেছিল—এসেই মেহেরকে জিজ্ঞাসা করেছিল চিঠিটা দাওনি কেন? তার প্রশ্নে ছিল ঘৃণা, ক্ষোভ।

মেহের বলেছিল—কেন? আমি তো আখতারকে দিয়ে পাঠিয়েছিলাম।

বাজে কথা বলো না।

তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে, আখতার ফেরৎ এনেছিল।

মিথ্যে বলার চেষ্টা করো না।

মেহের শহিদুলকে দিয়ে আখতারকে ডাকিয়েছিল, আখতার আসতে কামারুল জিজ্ঞাসা করার পর মেহেরকে ধমক দিয়ে বলেছিল তুমি তো আবার পাঠাতে পারতে।

মেহের বলেছিল—আমি চাকরী প্রার্থী নয় যে বার বার তোমাকে বিরক্ত করব, আর তোমার উপরেও নির্ভরশীল নয় যে তোমাকে তোষামদ করব। সৌরভ তোমার বন্ধু, ব্যাপারটা তোমাদের।

বিরক্ত কামারুল—কি বলতে চাইছ? আমার উপর নির্ভরশীল নয় তো চলছে কার টাকায়।

আব্বা ওগুলো নিয়ে আসুন তো।

কামারুলের আব্বা বারটি খাম নিয়ে এসে মেহেরের হাতে দেওয়ার পর মেহের সেই খামগুলো কামারুলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল তোমার পাঠানো বার মাসের টাকাগুলো তুমি নিয়ে যাও—ওগুলোর প্রয়োজন হয়তো তোমার আছে, আমাদের নেই।

শহিদুল বলে ওঠে—ভাবি, এই টাকাগুলো ....

তোমার বড় ভাইয়ের পাঠানো, কত আছে জানি না আমি খরচও করিনি। আমার আব্বার পাঠানো টাকায় আমাদের সংসার সুন্দর চলে যাচ্ছে। তাছাড়া যার সাথে সম্পর্ক নেই, যে সম্পর্ক রাখতে চায় না তার টাকা দেওয়ার অধিকার যেমন নেই, তার টাকা নেওয়ার অধিকারও আমাদের নেই।

সাব্বাস। ভাবি আমি তোমাকে ঠিক এতখানি বুঝতে পারি নি।

শহিদুল একটা খাম খুলে দেখেছিল দশ হাজার টাকা আছে। সে কেবল একরাশ ঘৃণা নিয়ে তাকিয়েছিল কামারুলের দিকে।

কামারুল টাকাগুলো নিয়ে ফিরে আসার আগে বলেছিল, তৈরী থেকো। আমি কয়েকদিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেব।

তারপর কেটে গেছে আরও দশটি মাস, নদীর অজস্র জল বয়ে জমা হয়েছে সমুদ্রের বুকে। মানুষের মনের পরিবর্তন হয়েছে অনেক, শহিদুলের মনেরও পরিবর্তন হয়েছে বেশ কিছুটা, দাদার প্রতি ঘৃণা, ভাবির প্রতি অন্যরকম একটা টান অনুভব করেছে মনে মনে।

তার মনে দ্বন্দ সেখান থেকে একটা অজানা ভয় যেখানে সমাজ নামক একটা ব্যাপার আছে। আছে তাদের ধর্মীয় কিছু নিয়ম।

সে কি করবে?

পার্টির মিটিং চলছিল অফিসে, শহিদুল সেই মিটিং থেকে দাদাকে ডাকলে উঠে এসে বেশ রাগত স্বরেই জিজ্ঞাসা করেছিল—

এখানে কি চাই?

তুমি কি সিদ্ধান্ত নিলে?

কেন তোর কি আমার সিদ্ধান্তের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে?

না তা হয়তো করছেনা, তোমাকে শেষ বারের মত অনুরোধ করছি তুমি ফিরে চলো।

সেই দিনই যাবো যেদিন তোর ভাবি ও ঘরে থাকবে না।

কি বলতে চাইছো।

ওর জীবদ্দশায় ও বাড়ীর ছায়া আমি মাড়াবো না।

তুমি কি ভাবিকে ত্যাগ করতে চাইছো।

হ্যাঁ, আমি ওকে তিন তালাক দিলাম।

ফিরে এসেছিল শহিদুল, তার মনে তখন মেহেরের প্রতি ভালবাসার প্রচ্ছন্ন ছায়া, সে ভালবাসতে শুরু করেছে মেহেরকে, মেহেরও কি তাই, সে প্রকাশ করে না কেন? কেন সে কর্তব্যের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে।

কামারুলের মনে উঠেছে ঝড়, সে যেন দেখতে পায় মেহের হারিয়ে যাচ্ছে, তবু রুঢ় দৃঢ়তায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে তিন তালাকের, আবার মনে প্রবেশ করে অতীতের ভালবাসার টুকরো টুকরো স্মৃতি, তার মনে চরম অস্থিরতা।

এইভাবেই কাটে আরও কিছু দিন, সেভাবে মেহেরকে তো তালাক দেওয়ার কথা উচ্চারণ করেছিলাম, মেহের কি আর আমার নেই।

হঠাৎ একটা উড়ো খবর কে যেন তাকে দিয়ে যায়, মেহেরে প্রতি তীব্র ঘৃণার ভিতরেও সুপ্ত ভালবাসা উঁকি দেয়, সে ছুটে যায় বাড়ী। তখন মেঘে ছেয়ে গেছে বৈশাখের আকাশ, ভ্যাপসা গরম। তখন কাল বৈশাখীর দিন।

তার পরণে সাদা পায়জামা, সাদা পাঞ্জাবী, কাঁধে লিফলেট এবং আরও কিছু প্রয়োজনীয় কাগজ ভরা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ।

বাড়ী ফিরে দেখেছিল মৌলবী সাহেব বসে আছেন। আরও সব গ্রামের মানুষ তার আশেপাশে, আব্বা, আম্মা, মেহেরের আব্বা আম্মা তারাও বসে আছেন। চলছে খানাপিনা।

শহিদুল মেহের বসে আছে সেই দুটি সিংহাসনে যার একটিতে তার বদলে শহিদুল। যার আসনগুলোর রং বদলে হয়েছে নীল রঙের। সম্রাট সম্রাজ্ঞীর মতো বসে আছে শহিদুল আর তার প্রাক্তনী।

কামারুল সব কিছু দেখেছে, কেউ তার সাথে কথা বলেনি, এমন কি তার আব্বা আম্মাও। তাকে যেন কেউ চেনে না, সে যেন বাড়ীর কেউ নয়, এমন কি রবাহুতও নয়।

তখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশের বুক চিরে, কামারুল বেরিয়ে পড়েছে বাড়ী থেকে রাস্তায়, সে দেখতে পায় এক ঝাঁক পাখী খুব দ্রুত গতিতে উড়ে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূবের দিকে, এবার ঝড় উঠলো প্রতীচির থেকে, সাথে আকাশ কালো করা ধূলোবালি, সে ঝড় এল ঈশান কোণে, কামরুলের হুঁশ নেই, তার মনেও কালবৈশাখীর ঝড় সে ঝড় পশ্চিম থেকে আসার মত পূর্ব স্মৃতি থেকে উঠে আস, সেই ঝড়ে সে যেন দিশেহারা, তার দৃঢ় প্রত্যয় চুরমার হতে হতে মিশে যাচ্ছে বালির সাথে।

ঝড়ের গতি বাড়ছে তীব্র থেকে তীব্রতম। কামারুল চলেছে একা সেই ঝড় ভেঙে ভেঙে, তার কাঁধে ঝুলানো লিফলেট ভরা শান্তিনেকতনী ব্যাগ।

লিফলেটগুলোও তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে মুক্ত আকাশে।

শুন্য শান্তিনেকতনী ব্যাগ নিয়ে সে জড়িয়ে ধরেছে শেষ সম্বল ইউক্যালিপটাস গাছটাকে, সেও যেন তাকে আশ্রয় দিতে নারাজ এই মাত্র ভেঙে পড়ে গেল।

তখনও ঝড়ের গতি থামে নি। এবার বৃষ্টি নামল মুসলধারে।

তত্ত্ব তালাশ

এই যে শুনছেন। কি হল শুনতে পাচ্ছেন না, আমি শ্রাবণী বলছি। শ্রাবণী চক্রবর্ত্তী, শুনছেন।

আমাকে বলছেন।

আপনাকে নয়তো কি আপনার সামনে আপনাকে ছায়া করে দাঁড়ানো দেবদারুকে বলছি।

আমি তো আপনাকে ঠিক ....

চিনতে পারছেন না, তাইতো! আমি বোধহয় ভুল করিনি। আপনি চয়ণ চৌধুরী। এই গনগনিখোলোয় এই দেবদারু তলায় ....

চার বছর আগে ....

ভুল করছেন, আমার নাম শ্রীবাস মজুমদার।

নামটা পাল্টে নিয়েছেন?

কি ব্যাপার বলুনতো?

বলছি নামটা বদলে নিয়েছেন, তাইতো! ধান্ধাবাজরা তাই করে, অথবা criminal রা।

আপনার কোথাও একটা ভুল থেকে যাচ্ছে। আমি চয়ণ চৌধুরী নয়। শ্রীবাস মজুমদার। কাঁথিতে বাড়ী, বাবার নাম অবিনাশ মজুমদার—দু বৎসর আগে প্রয়াত হয়েছেন।

কিন্তু ডান চোখের নিচে কাটা দাগটা লুকোতে পারলেন না তো। ওটা তো প্লাস্টিক সার্জারী করে নিতে পারতেন। তাহলে আপনার identification mark টা থাকতো না। আমি চিনতেও পারতাম না।

ওটা কাটা দাগ নয়। ছোটবেলায় বসন্ত হয়েছিল তার দাগ।

সে দিনতো বলেছিলেন খেলতে গিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের বুটের নালে চেরা হয়ে গিয়েছিল। আরও বলেছিলেন প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তার বাম পায়ের গোড়ালি ভেঙে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন কোনদিন যদি হারিয়ে যাই বা "কোন দুর্ঘটনায় মারা যাই এই দাগটা দেখে আমাকে সনাক্ত করবে কেমন।"

সরি আপনার সাথে বক বক করতে পারব না, আমার অনেক কাজ আছে।

সে কি, অনেক কাজ! তাহলে দেবদারুর ছায়ায় পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

আপনি জানলেন কি করে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আছি?

আমি যে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি।

তাহলে আগেই জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

দেখছিলাম আপনি সেই মানুষটি কিনা!

সেই মানুষটি মানে?

মনে নেই আজ ১১ই চৈত্র, পূর্ণিমা। চার বৎসর আগের ঘটনা।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আপনি তো কিছুই বুঝতে পারবেন না! তা আজ আবার কি কোন নতুনকে জন্মদিন পালনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন?

দেখুন শ্রাবণীদেবী, আপনি বোধ হয় আপনার সীমারেখা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। কিভাবে কথা বলতে হয় তাও জানেন না।

বা ঠিক একই ধরনের কথা বলছেন তো, ওটাও বদলাতে পাবেন নি।

কেন আপনাকে কি ঐ ধরণের কথা কোনদিন বলেছিলাম।

এখানে আমাকে বলবেন কেন? আমাকে বললে সেদিন কি থাকতাম। বলেছিলেন সেই ভদ্রলোককে, যে আপনাকে অনুরোধ করেছিল। এখানে বেশীক্ষণ থাকবেন না, যে কোন মুহূর্তে গন্ডগোল বাঁধতে পারে।

আপনি বলেছিলেন বেশী জ্ঞান দেবেন না তো।

তারপর দু এক কথার পরে আপনি ঠিক ঐ কথা ভদ্রলোককে বলেছিলেন।

কি ঝামেলায় যে পড়লাম। কোথা থেকে যে একটা ছিনে জোঁক জুটে গেল ....

এই তো সেই কথাটাই। যে কথাটা তখন রাত্রি আটটা বোধ হয়, বনের ভিতর জীবনের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি উপভোগ চলছে তখন আমার গালে চুমু খাচ্ছিলেন পাগলের মত। "আমি বললাম ছাড়ো।" আপনি বললেন ছিনে জোঁকতো, তাই ছাড়ছেনা।

দেখুন আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আপনাকে আমি চিনিনা, চয়ণ আমার নাম নয়, বছর দুই হল এখানে এসেছি, বিয়ে করিনি ঠিকই কিন্তু কোন মেয়ের সাথে আজ পর্যন্ত প্রেমটেম আমার জমে নি, চুমু খাওয়াতো দূরের কথা।

গড়বেতা থেকে গনগনিখোলা তখন মায়াবী জ্যোৎস্না মাখা সন্ধ্যা নামছে, জোড়ায় জোড়ায় আসছে গনগনিখোলায় বা তার আসে পাশে। কেউ কেউ জায়গা করে নিয়েছে শাল, মহুয়া, পিয়াশাল, দেবদারু অথবা কাজুবাদামের অপেক্ষাকৃত আড়ালে থাকার মত জায়গায়। কেউ কেউ খবরে কাগজ পেতে মুড়ির সাথে চানাচুর, নারকেল কুচি, জমিয়ে খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। খাওয়ার থেকে জমে থাকা যত কথা যেন শেষ নেই। কখনও কখনও চুমু খাচ্ছে একে অপরের। মাথার উপরে গাছের ডালে দলে দলে শালিক এসে বসছে এবার চলে যাবে যে যার বাসায়, তাই দিনের শেষ কথাগুলো সেরে নিচ্ছে। ফিঙ্গে পাখীগুলো এরোপ্লেনের মত গোপ্তা খেয়ে নেমে আবার উঠে চলে যাচ্ছে কোথায়? কে জানে! দু একটা বুনো বিড়াল ধীরগতি নিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চোখের বাইরে চলে

যাচ্ছে। কয়েকটা শৃগাল এদিকে আস্তে আস্তে মানুষের কথা শুনে দৌড়ে পালাচ্ছে। ভাগ্যিস এখানে দু চারটে কুকুর আসে নি। তাহলে বুঝতে পারতো কত ধানে কত চাল।

নিরবতা.ভেঙে বলে উঠল শ্রাবণী

আপনি কোন স্কুলে কাজ করেন?

আপনাকে বলব কেন?

বেশ বলতে হবে না, আমি ঠিক জেনে নেব।

কি ভাবে!

যে ভাবে খোঁজ করলে জানা যায়, যেভাবে একটা মাত্র ক্লু ধরে তত্ত্ব তালাশ করে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।

আপনি কি গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করেন নাকি!

বলব কেন?

বেশ বলতে হবে না। দয়া করে আপনি এখান থেকে যান। আজে বাজে কথা না বলে একটু একা থাকতে দিন।

আচ্ছা আপনি কেমন মানুষ বলুন তো!

কেন?

একজন মহিলা, তাও অবিবাহিতা যুবতী, বসতেও বলছেন না।

কেন, এটা কি আমার বাড়ী যে অতিথি আসছেন, তাকে খাতির করে বসতে বলব, যথাসম্ভব আপ্যায়ণ করব।

ধরুণ আমি যদি আপনার পরিচিতা হতাম, কিংবা ধরুন যদি এসব অবান্তর প্রশ্ন না করতাম, অথবা ধরুন অন্যভাবে যদি আপনাকে আহ্বান জানাতাম—তাহলেও কি আপনি বলতেন না—দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছেন না আসুন না এই দেবদারুর তলায় একটু বসি। তা নাই করলেন, ব্যবহারটাতো একটু ভাল করতে পারেন।

কি মুস্কিল বলুন তো, খারাপ ব্যবহারটা আমি কখন করলাম। আপনিই তো আমাকে চয়ণ চৌধুরী ভেবে আজে বাজে প্রশ্ন করে বিব্রত করছেন।

সরি, আর করব না, কিছু খাবার টাবার এনেছেন তো; নাকি সবাই খাচ্ছে আমরা শুধু গল্প করে যাব।

যাক, তাহলে মনে হচ্ছে এবার শান্তি দেবেন!

আসুন না সবাই বসে গল্প করছে। আমরাও এই খানটাতে বসে একটু গল্প গুজব করি।

চেনা নেই পরিচয় নেই, কি গল্প করব বলুন তো!

বাসের সীটেও তো অপরিচিতা ছিলাম, পাশে বসতেই সে ব্যবধানটা মুছে দিয়ে আপন

করে নিলেন, সেই ভাবেই শুরু করবেন, তাছাড়া চেনা পরিচয় তো পথে ঘাটে, ময়দানে পার্কে, আড়ালে আবডালেই হয়।

খুব সুন্দর কথা বলেন তো।

তাহলে মন গলছে বলুন।

আপনার নামটা কি যেন বলছিলেন?

তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছেন তো? মনে করুন, মনে করুন।

শ্রাবণী রায়, তাইতো?

তাই বলুন এত সহজে কি ভোলা যায়।

কি করেন?

শিক্ষিকা।

কোথায়?

এই গড়বেতাতেই।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু কোন স্কুলে।

সেটা তো বলব না।

কেন?

আপনিও তো বলেন নি।

এখানে কি মাঝে মাঝেই আসেন?

না তেমন নয়।

তাহলে প্রথম বার?

চারবার।

তার মানে?

একবার চয়ণ চৌধুরীর সাথে, দ্বিতীয়বার তার খোঁজে, তৃতীয়বার একই উদ্দেশ্য, চতুর্থ বারও তাই, তবে মনে হচ্ছে এবারে এসে লাভ হয়েছে।

তার মানে?

এই যে আপনার সাথে পরিচয় হল, গল্প করছি।

চয়ণ চৌধুরীর কথা বলছিলেন না, উনি কে?

তিনি বলেছিলেন—তিনি নাকি কোন এক স্কুলের শিক্ষক।

কোন স্কুল সেটা বলেন নি?

না, তেমন বিশেষ স্কুলের নাম বলেন নি, বলেছিলেন বিষ্ণুপুর।

এখানে আসতেন?

আসতেন এবং এখন আসেন। আজও হয়তো এসেছেন।

তার মানে?

উনি প্রতি বৎসর এগারই চৈত্র এখানে জন্মদিন পালন করেন নতুন বান্ধবীকে নিয়ে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।

না জানলে অথবা জেনেও না জানার ভান করলে বুঝবেন কি করে।

আবার আজে বাজে কথা বলছেন?

সরি আর তেমন করে বলব না।

ওনার সাথে পরিচয় হল কিভাবে?

জানবেন নাকি স্মৃতি রোমন্থন করবেন?

কি সব হেঁয়ালী যে করেন।

দেখুন মনে করতে পারেন কিনা।

কি ভেবেছেন বলুন তো!

আহা রেগে যাচ্ছেন কেন, এমন তো পুরুষ, মহিলার জীবনে প্রায়ই ঘটে। সে রকম তো আপনারও ঘটতে পারে

আমি তো বললাম, আমি প্রেমটেম করিনি এখনও।

সরি, শুনুন তাহলে—চার, সাড়ে চার বৎসর আগে, পূজোর ছুটি পড়তে কয়েক দিন বাকী, মেদিনীপুর থেকে ফিরছি দেশের বাড়ী ধাদিকা, তখন নটা।

ওখানে কি করতেন?

ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. করতাম।

কোন সাবজেক্ট!

[illegible]।

[illegible] সময় বুধবার, শনিবার বাড়ী আসতাম, তেমনই এক বুধবার বাড়ী আসব [illegible] বসেছি বাঁদিকের একটা সীটে। এক ভদ্রলোক বাসে উঠে দেখলেন [illegible] খালি কোথাও নেই। আমার সীটে আমি ছাড়া আমার ব্যাগ ছিল, জিজ্ঞাসা [illegible] আছেন কি?

না কেউ নেই।

বসছি তাহলে?

বসুন।

কোথায় যাবেন?

ধাদিকা।

যাতায়াত করেন।

না মাঝে মাঝে।

মাঝে মাঝে! বুঝলাম না।

ঐ শনিবার বিকালে, বুধবার সকালে।

এইভাবে শুরু হল পরিচয় পর্ব। একদিন কোন সীট না থাকায় দাঁড়ালেন আমার সীটের পাশে। তারপর শুরু হল আসল ধানাই পানাই।

তারপর?

নাম বললেন চয়ণ চৌধুরী, কোন ভাই নেই, বোন ছিল বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা নেই, সংসারে কেবল মা, ছেলে।

বিয়ে করেন নি?

করব করব ভাবছি।

পাত্রী দেখছেন?

দেখছি তো।

কোথায়?

এই বাসেই।

তার মানে?

মানে, যিনি সীটে বসে আছেন, যার পাশে আমি দাঁড়িয়ে আছি, তাকে।

এইভাবেই শুরু হল ঘনিষ্ঠতা। প্রেমালাপ, সেখান থেকে কিছু কিছু উপহার।

তারপর!

মনটাও গলতে শুরু হল, বুঝতেই তো পারছেন আপনার মত হ্যান্ডসাম, দায়দায়িত্বহীন একা মানুষ, তাও শিক্ষক, কে না স্বপ্ন দেখে বলুন। আপনি থেকে তুমিতে নামা হয়ে গেছে তৃতীয় মাসেই।

তারপর?

তখন চৈত্রের প্রথম সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন হবে বোধ হয়। বলল জান শ্রাবণী আগামী শুক্রবার এগার তারিখ আমার জন্মদিন।

তাহলে তো কিছু উপহার দিতে হয়।

আমি ঠিক তা বলছি না।

তবে!

ঐ দিন তুমি যদি আসতে খুব ভাল লাগত। আসতে পারবে?

কি করে আসব, আমার যে class আছে।

দেখ যদি সম্ভব হয়, তাহলে জন্মদিনটা বেশ আনন্দে কাটবে।

আসতেই হবে?

যদি খুব অসুবিধা হয়, তাহলে আসতে হবে না, অন্যান্য বৎসরের মত একাই কাটিয়ে নেব।

বেশ আসব, কিন্তু কোথায়?

সত্যি আসবে!

বললাম তো,

তাহলে গড়বেতাতে নামবে, ওখানে কিছু কেনাকাটা করে বেড়াতে যাব গনগনিখোলা।

এসেছিলেন?

আসতে তো হলই।

কি আনলেন?

রজনীগন্ধার stick, আর জীবনানন্দের রূপসী বাংলা।

তারপর?

গড়বেতাতে নেমে দেখি চয়ণ দাঁড়িয়ে আছে বাসের দিকে তাকিয়ে, আমাকে নিয়ে গিয়ে উঠল একটা রেষ্টুরেন্টে। ওখানে খাওয়ার পর, পাশের দোকানে কিছু কাজু কিনে নিয়ে বলল, চল এবার যাওয়া যাক।

দেরী করা চলবেনা কিন্তু, আমাকে মেদিনীপুর ফিরে যেতে হবে।

বেশ দেরী হবেনা। কিন্তু আজ কি না গেলেই নয়?

না, না, রাত্রিতে টিউশান যেতে হবে, শনিবার class আছে।

তারপর?

গনগনিখোলাতে গেলাম, একটা রিক্সাতে চড়ে। তারপর কিছুটা হেঁটে। কি অপূর্ব যে লাগছিল বন্য পরিবেশটা সে বোঝানো যাবে না, গিয়ে বসলাম এই দেবদারুর তলায়। ঘাসের উপরে।

তারপর?

চয়ণকে দেখে, তার প্রাথমিক ব্যবহারে মনে হল, সত্যি আমি ধন্য, চয়ণের মত একজন পুরুষ পেয়ে, সে রূপসী বাংলার কবিতা পাঠ করে শুনাচ্ছিল অপূর্ব ব্যঞ্জনায়, আমি অবাক হচ্ছিলাম, আমি আপ্লুত হচ্ছিলাম তার গলার মিষ্টি স্বরে। মাঝে মাঝে বলছিল—শ্রাবণী কি মনে হচ্ছে জানো?

কি?

আজ এখানেই কাটিয়ে দেব সমস্ত সময়।

সে কি সন্ধ্যা নেমে যাবে, আর নয় এবার ফিরে যেতে হবে উঠে পড়।

আর একটুক্ষণ বসতে পার না।

কিন্তু ....

সন্ধ্যা নামছে একটু একটু করে। ঐ দেখ শ্রাবণী চাঁদটা উঠছে অজস্র জ্যোৎস্না নিয়ে, ঐ দিকে দেখ সব জোড়ায় জোড়ায় কেমন কাটাকুটি খেলায় মেতেছে।

ছিঃ ছিঃ—কি বেহায়পনা।

কেন?

ওরা কি এর জন্যই লোকালয় থেকে এখানে আসে?

হয়তো তাই।

এখনই যদি এসব সেরে নিল, তাহলে ভবিষ্যতে কি করবে।

তুমি সত্যিই কিছু বোঝনা শ্রাবণী।

আমার বোঝার দরকার নেই, দেখতেও ভাল লাগছে না, এবার ওঠ তো দেখি।

শ্রাবণী—Please, আর একটু থাকো।

তারপর?

একটা সিগারেট ধরাল চয়ণ, সেটা শেষ করল, তারপর বলল—শ্রাবণী ইচ্ছে করছে তোমাকে একটা kiss করি।

না, এসব আমার ভাল লাগেনা।

না বলতে নেই, দেখছোনা ওরা কি করছে।

ছিঃ ছিঃ তুমি না শিক্ষক, ওদের মত চ্যাংড়া তো নয়।

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে ওদের মত romantic হয়ে যাই।

কি বলছ চয়ণ, তুমি..............

Please একটা kiss করতে দাও।

আমার একদম ভাল লাগছে না। আচ্ছা চয়ণ তুমি এখানে কখনও এসেছ।

হ্যাঁ, প্রতি বৎসরই আমি এই এগারই চৈত্র.................

একাই?

দুজন তো ছিল না, এই প্রথম দুজন এলাম।

অন্য কোন সময়?

না, বিগত দশ বৎসর, আমার জন্মদিনটা এখানেই কাটাই।

কি করতে?

বসে বসে দেখতাম এখানকার গাছ, এখানকার পরিবেশ, এখানে যারা আসে তাদের। সিগারেট খেতাম একটার পর একটা তারপর চলে যেতাম।

এবারটা, অন্যরকম তাই না।

হ্যাঁ শ্রাবণী অন্যরকম, সেই অন্যরকমটা একটু অন্যভাবে কাটাতে চাইছি। সে সুযোগ তুমি দেবে না?

কি বলতে চাইছ তুমি।

ধরো তোমাকে তো বিয়ে করবই, তার আগে আজ তোমাকে একটু আদর করব।

কিভাবে?

হাতটা দাও।

কেন?

একটা চুমু খাবো।

না চয়ণ, তোমাকে মানায় না। তাছাড়া সবাই দেখবে।

কেউ দেখবে না, দেখছ না সবাই কেমন ব্যাস্ত।

আমি যতবার বলছি, কি হচ্ছে চয়ণ ছেড়ে দাও, আমি চলে যাব, আমার ভাল লাগছে না, শরীর খারাপ কিছুতেই ছাড়ছে না, বলছে আজ তোমাকে পাগল করে দেব।

চয়ণ ভাল হচ্ছে না, ভুলে যেওনা তোমার জন্মদিন, তুমি নিমন্ত্রণ করেছ, সে নিমন্ত্রণ তোমার সম্মান রক্ষার জন্য আমি গ্রহণ করেছি, অথচ তুমি যা চাইছ তা অন্যায়, তুমি এটা করতে পার না।

যাকে বিয়ে করব ঠিক করে ফেলেছি, তাকে সবকিছু করা যায়।

তুমি বিয়ে করবে তার গ্যারান্টি কোথায়?

তারপর?

তার গলায় একটা সোনার চেন ছিল, ঠিক আপনার গলায় যেটা আছে সেইরকম। খুলে পরিয়ে দিল আমার গলায়, তারপর আরম্ভ করল পাগলামি। যত বলছি চয়ণ আমার শরীর খারাপ, সে যেন শুনতেই পাচ্ছে না।

আপনি চিৎকার করলেন না কেন?

পারতাম, করলাম না কেন জানেন—তখন জেনে গেছি আমি নিরূপায়, আশা করেছিলাম, স্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা পবস্পর পরস্পরকে বিয়ে করব।

তারপর?

যখন উঠলাম তখন রাত্রি নটা। না হল মেদিনীপুর যাওয়া না হল ধাদিকা যাওয়া।

কোথায় থাকলেন?

চয়ণের এক বন্ধুর বাড়ীতে, রাধানগরে।

চয়ণও ছিল আপনার সাথে?

না সে আমার কাছে আসে নি।

পরের দিন ফিরে গেলাম মেদিনীপুরে। সমস্ত রাস্তায়, ক্লাসে, ক্লাসের বাইরে, হোস্টেলের একাতিত্বে চয়ণ যেন ভিত খুঁড়ে বসে আছে মনের মধ্যে, কখনও তার ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা,

কখনও যে স্বাদ জীবনে পাইনি সেই স্বাদ পাওয়ার তৃপ্তি। আনন্দে ভরে যাচ্ছে মন। সপ্তাহ শেষ হতে না হতেই ভাবছি বুধবারটা যেন তাড়াতাড়ি আসে।

বুধবার এল বাস স্ট্যান্ডে গেলাম, সীট রাখলাম ঠিক আমার পাশে। ব্যাক ব্রাশ করা কাল প্যান্ট সাদা জামা অথবা ছাই রঙের প্যান্ট নীলাভ জামা ফরসা কাউকে দেখলেই মনে হত চয়ণ আসছে। কিন্তু চয়ণ আসে না। এইভাবে কেটে যায় এক একটি বুধবার। চয়ণ যেন হাওয়ায় ভর করে উড়ে গেছে কোথাও।

তারপর?

খোঁজ করেছি বহু জায়গায়, প্রতিটি স্কুলে।

দেখা পেয়েছিলেন?

না, প্রতিটি স্কুল বলছে চয়ণ চৌধুরী বলে কোন শিক্ষক এখানে কাজ করে না।

তারপর?

তারপর আর কি। একটা ব্যাপার আমার মাথায় ছিল, প্রতি বৎসর ১১ই চৈত্র গনগনিখোলাতে সে যায়, তেমনই সে বলেছিল এবং ধারণা হয়েছিল কোন না কোনদিন কাউকে না কাউকে নিয়ে সে যাবেই।

এসেছিল?

চার বৎসর তাকে খুঁজেছি আজ হয়তো তাকে পেয়েছি।

কি বলছেন আপনি!

আচ্ছা, আপনি তো এখানে রয়েছেন প্রায় দেড় ঘন্টা হয়ে গেল তাই না?

হবে হয়তো।

কেউ তো আসল না!

আমি তো অন্য কারও জন্য আসিনি।

তাহলে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন কেন?

কই না তো।

দেখুন আপনি যেভাবেই কথার জাল বুনুন না কেন প্রমাণ করতে পারবেন না আমি চয়ণ চৌধুরী।

কিভাবে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, অথবা পাওয়া গেলে কিভাবে প্রমাণ করা যাবে তার একটা পরিকল্পনা যদি দেন খুব ভাল হয়। শ্রীবাসবাবু দেবেন?

আমি কি করে দেব।

আপনি কোন স্কুলে চাকরী করেন যেন?

আপনাকে বলে আমার লাভ।

তাহলে কি ধরে নেব আপনি বেকার?

ধরতে পারেন।

আপনার ডান চোখের নিচে কাটা দাগটা যেন কিসের বললেন?

বললাম তো, ছোট বেলাতে একটা ফোঁড়া হয়েছিল।

আপনি কিন্তু আগে বলেছেন—দাগটা বসন্তের।

ঐ হল, প্রথমে বসন্ত, পরে ফোঁড়া হয়েছিল।

খুব ছেলেবেলায় তো, তাই ঠিক ঠিক মনে রাখা সম্ভব হয় নি, তাই না!

একজাক্টলি।

এমনও তো হতে পারে, খেলতে গিয়ে ....

না, না তা হবে কেন?

একটু আগেই তো বললেন ছেলেবেলার সবকিছু মনে নেই।

আচ্ছা আপনি রিয়াকে চেনেন?

কে রিয়া!

রিয়া ঘোষ।

না।

একটু মনে করে দেখুন না, পারলেও পারতে পারেন।

কি করে সম্ভব বলতে পারেন। যাকে আমি কোনভাবে জানি না চিনিনা তাকে মনে করব কিভাবে।

আজ এগারই চৈত্র পূর্ণিমা। কি অদ্ভুত ব্যাপার বলুনতো!

কি ব্যাপার?

আজই তো আপনার জন্মদিন।

সে তো হতেই পারে।

তাবলে আজকের দিনটাই।

জন্মগ্রহণ করলে তার একটা তারিখ, সময় থাকে এর মধ্যে অবাক হওয়া বা নতুনত্ব খোঁজার কি আছে?

গত তিন বৎসরের জন্মদিন কোথায় পালন করেছেন?

এবার আমি উঠব। ভাল লাগছে না।

অনেকে কিন্তু আমাদের দুজনকে দেখছে, কেউ কেউ হয়তো আমাদের কথাও শুনছে, উঠলে কি খুব ভাল হবে?

তার মানে!

মানে এখানে যারা এসেছে তারা। সেদিনের মত চোখ বন্ধ করে নেই, সবদিক খোলা রেখেছে।

আপনি কি ....।

সত্য কথাটা জানতে চাইছি।

কি জানতে চান?

রিয়াকে আপনি চেনেন এবং তাকে এখানে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করেছেন।

মিথ্যা কথা।

দূরে ঐ যে ফাঁকা জায়গাটা, ওখানে একটা বাদাম গাছ দেখতে পাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

আর কি দেখছেন?

কে যেন একজন বসে আছে।

আর একটু ভাল করে দেখুন। একটা মেয়ে বসে আছে।

ঠিক বুঝতে পারছিনা।

আমি দেখেছি, তার পরনে বেগুনী শাড়ী, মাথায় বেল ফুল, গলায় না এখনও কিছু পরেনি। ওর হাতে রজনীগন্ধার টাটকা stick আপনার জন্মদিনের উপহার। আর মেয়েটা আপনার শরীরকে তার অনন্য উপহার দেবে বলে হয়তো তৈরী হয়ে এসেছে।

আচ্ছা, আপনি কি আমাকে কোন criminal পেয়েছেন যে একটার পর একটা জিজ্ঞাসাবাদ করে চলেছেন।

আপনার এসব মনে হচ্ছে কেন? ধরুন না কেন আজ এই পূর্ণিমায় চৈত্রের এগার তারিখে নতুন করে নিজেকে নিবেদন করব স্থির করার পর একবার যাচাই করে নিচ্ছি।

সত্যি, আপনি রসিকতা করতে ভালই জানেন।

আপনি আগে জানতেন না, তাইতো?

না, তা জানতাম না।

তাহলে কি জানতেন?

চিনতামই না তো, এসব জানবো কি করে।

সে কি এক্ষুণি বললেন রসিকতা জানি বলে জানতেন না।

বেশ এবার তাহলে রিয়াকে ডাকি।

কে রিয়া, কেনই বা ডাকবেন।

সে বেচারা ফুলের তোড়া নিয়ে সেই বিকেল পাঁচটা থেকে একা একা বসে আছে, এবার তার একাকিত্বে একটু সঙ্গ দিন।

এসব আমার ভাল লাগছে না।

আপনার গলায় একটা চেন দেখছিনা। ওটা কি ইমিটেসেনের?

না সোনার।

কার জন্য, রিয়ার?

এটা পরে থাকা আমার সখ।

আপনি তো শিক্ষক, তাই না!

হ্যাঁ।

সোনার চেন কেনার মত রোজগার তো আপনার আছে, এই চেনটা দেখুন তো, সোনার নাকি ইমিটেশেনের।

আপনি কিন্তু ব্যাক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন।

সে তো বটেই, তাছাড়া আপনি কাকে কি কখন দান করেছেন বা তার স্বর্বস্ব লুট করে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন কিনা আমার জানার দরকারটাই বা কি।

এর বেশী বাড়াবাড়ী করলে আমি পুলিস ডাকতে বাধ্য হব।

পুলিশকে কি বলবেন?

কেন? পুলিশ কে ভয় পান না।

না তো!

আচ্ছা ডাংপেটা মেয়ে তো!

ছিলাম না, হয়ে গেছি। আচ্ছা আপনি সোমশংকর ব্যানার্জীকে চেনেন?

না তো!

তার বাড়ী মেদিনীপুরে, তাই না?

কি মুশকিল, আমি তাকে চিনি না, বাড়ী জানবো কি ভাবে।

গোয়ালতোড়ে ভদ্রলোক শিক্ষকতা করেন, ভূগোলের শিক্ষক, তাই না।

হবে হয়তো।

হবে হয়তো—মানে তো চিনলেও চিনতে পারেন।

কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব।

একটা কেন একশ করতে পারেন।

শ্রাবণী দেবী—আপনি সুস্থ তো?

কেন বলুন তো?

বলছি মানসিক ভাবে সুস্থতো?

আপনার কি মনে হয়।

মনে হচ্ছে, আপনার একবার মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞকে দেখানে উচিৎ।

করেছিলাম তো, তিনি তো বলেছেন তেমন কিছু দেখছি না। আচ্ছা শ্রীবাসবাবু—গোয়লতোড় গড়াবেতা থেকেও তো যাওয়া যায়?

হয়তো যায়।

আপনার এই গড়বেতাতে বন্ধু বাড়ীটা কোথায় যে বাড়ীতে চার বৎসর আগে এগারই চৈত্র শ্রাবণী বলে মেয়েটিকে রাত্রে রেখেছিলেন।

তখন সন্ধ্যে সাতটা দু এক জোড়ো উঠে চলে যাচ্ছে যে যার বাড়ীর পথে। নতুন যারা আসছে তারা প্রেম বা আড্ডার জন্য নয়, contract করে আসছে গনগনিখোলায়। মদ খাবে ফুর্তি করবে। আগে ছিল, এখন রাজনৈতিক কারণে অযথা পুলিশের হুজ্জুতি নেই। মানুষ অনেক শান্তিতে এখন বাস করে। কথায় কথায় ঘর ছেড়ে পালাতে হয় না। তেমন খুনখারাপিও হয় না, মানুষ একটা কথা অন্তত বুঝেছে। যে রাজা তার মনের মত প্রজা হয়ে থাকার থেকে সুখ কিছু নেই, তারা বিপদে আপদে সম্পদে পাশে থেকে সহযোগীতার হাত বাড়াবে।

শ্রীবাসবাবু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছেন বার বার। চেষ্টা করছেন কিভাবে এখান থেকে কেটে পড়া যায়। লক্ষ করেছে শ্রাবণী। ডাক দেয়—

এই রিয়া এদিকে এসো তো?

কেন ওকে ডাকছেন কেন?

দেখুন না কি মজাটা হয়।

আমি এবার সত্যিই চলে যাব।

আমিও তো চলে যাব, তার আগে ....

তার আগে।

পাগলি মেয়েটার হাত সাফাইটা দেখে যাবেন না।

কি বিপদে পড়লাম রে বাবা।

বিপদে পড়লেন বলছেন কেন? বিপদ থেকে উদ্ধার হচ্ছেন বলুন এই যে রিয়া, তুমি এই ভদ্রলোককে চেন।

হ্যাঁ।

কতদিন থেকে চেনো?

প্রায় চার মাস।

কিভাবে প্রথম পরিচয় হল।

মেদিনীপুর থেকে ফেরার পথে, বাসে।

কি নাম ওনার?

শুভঙ্কর ব্যানার্জী।

তোমার কাছে ওনার হাতের লেখা কোন চিঠি আছে?

হ্যাঁ।

দেখি, এই তো। একই হাতের লেখা। আচ্ছা শুভঙ্কর বাবু, দেখুনতো দুটো চিঠির লেখক এক কিনা, পার্থক্যটা কোথায়।

না না এসব আমার হাতের লেখা নয়।

বেশ চেন দুটোর মধ্যে—মানে আপনার গলায় যেটা আছে এবং আমরা হাতে যেটা আছে এই দুটোর মধ্যে তফাৎ কোথায়।

না ওটা আমার দেওয়া নয়।

আপনি বলছেন, হাতের লেখা বা চেন কোনোটাই আপনার নয়। অথচ কাউকে না কাউকে দেন।

কি চুপ করে আছেন যে!

আচ্ছা রিয়া তোমাকে তো নিমন্ত্রণ করল, কি বলে করল।

আমার মা ছাড়া কেউ কোথাও নেই, ভাবছি বিয়ে করতে হবে, মাও চাপ সৃষ্টি করছেন। তুমি এসনা আমার জন্মদিন এগারই চৈত্র। ঐ দিন আমরা পরস্পর পরস্পকে আরও ভালভাবে জানব। তাছাড়া Final কথাবার্তাটাও সেরে নেব।

আর কিছু?

আমার জন্মদিনগুলো কাটে সঙ্গী বিহীন, এই প্রথমবার আমার জন্মদিনে তুমি থাকবে, উপভোগ করব নতুন করে।

আর কিছু?

যদি না এস তাহলে জানব পৃথিবীতে আমার বলতে কেউ নেই।

বা বেশ সুন্দর একটি নাটকের পুনরুপস্থাপনা। শুভঙ্করবাবুর দিকে তাকিয়ে—

কিন্তু সমস্যা হল—আগের তিনটে বৎসর কোথায় ছিলেন?

কি কিছুতো বলুন, বুঝতেই পারছেন সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেক আগেই।

দেখুন শ্রাবণীদেবী ....

পিছনে একটু দেখুন কারা আসছে।

কারা আসছে?

দেখুন না একটু ঘুরে, চিনতে পারেন কিনা, দেবব্রতবাবু এদিকে শুভঙ্করবাবুর সামনে আসুন, শুভেন্দুবাবু আপনিও আসুন, দেখুন তো আপনারা একে চেনেন কিনা?

আরে সোমশংকর না, কি ব্যাপার, এখানে, এত রাত্রিতে।

এটাও কি আমার পাগলামীর symptoms, কি শুভঙ্করবাবু ওরফে চয়ণ বাবু ওরফে শ্রীবাস বাবু ওরফে সোমশংকর বাবু।

এসব কি হচ্ছে?

আপনার জন্মদিনটা বেশ ভালভাবেই কাটল তাই না।

তোমার জবাব নেই শ্রাবণী, যেভাবে সোমশংকরকে ঘায়েল করলে, তোমার তারিফ না করে পারছি না।

কি দেবব্রত এই সোমশংকর যে ক্ষতিটা আমার করেছে যে ক্ষতিটা রিয়ার করতে গেছল তার কি হবে?

তোমার কথা ভুলে যাও শ্রাবণী আমি তো সবকিছু জেনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

দেবব্রত please আমাকে ক্ষমা করে দে ভাই।

সে তো দিতেই হবে, কিন্তু রিয়ার কি হবে, ওতো ব্যাপারটা না বুঝে হতভম্ব হয়ে গেছে।

শুভেন্দু ব্যাপারটা খুলে বলল—

শ্রাবণী রিয়াকে সমস্ত কিছু না জানিয়ে সোমশংকরের পিছনে লাগিয়ে দেয়, অবশ্য রিয়া তখন সোম এর নাম জানত না, বলা ভাল জানানোও হয়নি। সুন্দরী মেয়ে টোপটা গিলে ফেলে সোম। তারপর আজকের এই ঘটনা।

আমাকে ক্ষমা করে দিও রিয়া। আমি সোমশংকরবাবুর এই সব ধূর্তামি চিরতরে বন্ধ করার জন্য এই নাটক মঞ্চস্থ করেছি। জানি সোমশংকরবাবু আমাকে আর পাত্তা দেবে না।

কিন্তু শ্রাবণীদি, দেবুদার ব্যাপারটা।

ওর সাথে পরিচয় হয় বছর দেড়েক, তখন সবে চাকরীটা পেয়েছি, তারপর যা হয়।

শুভেন্দু বলল—আর দেরী কেন। শুভষ্য শীঘ্রম।

আগামী মঙ্গলবার মেদিনীপুর কোর্টে দুজোড়া বিবাহ হবে প্রথমটা ঠিক ছিল শ্রাবণী এবং দেবব্রত, দ্বিতীয়টা সোমশংকর এবং রিয়া। কি সোম রাজীতো নাকি? তারপর যতবার খুশি গনগনিখোলা আসবি।

কিন্তু সোমশংকর বাবু আপনি জলজ্যান্ত বাবাকেও এইভাবে বার বার মেরে দিচ্ছেন কেন বলুন তো,

আমাকে ক্ষমা করে দাও শ্রাবণী।

সে তো দেবো, কিন্তু বাবার দোষটা কোথায়।

বাবা ভীষণ রাশভারী, জানলে বিপদে পড়ে যাব। তাই কেউ তার কাছে পৌঁছতে যাতে না পারে।

তাই বাবাকে মৃতের খাতায় রেখে—খেলা চলছে।

আর লজ্জা দিওনা, তোমরা যা বলবে তাই করব।

ওরে রিয়া, এবার ফুলের তোড়াটা তোর হবুবরের জন্মদিনে উপহার হিসেবে দিয়ে দে। আর কিছু থাকেতো সেরে নে।

দেবব্রত শুভেন্দু দা আমরা সবাই বাদাম তলায় আড়ালে দাঁড়াই চল।

———

কোটালের জল

গরীব গুবরোদের গ্রাম, হরিহরপুর। ছোট ছোট জঙ্গল ঘেরা, এখানে ওখানে ফলন্ত কলা গাছে। কয়েকটা কাঁটা বাঁশের ঝাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে, দু একটা ডোবা—শাপলা, লম্বা লম্বা ঘাসের চাঙড়, মাছ থাক না থাক ডোবার ধারে গেলেই চাপা দিতে হয় নাকে। সমস্ত গ্রামে গরীব হতচ্ছাড়াদের ঘর। আর ঘরগুলোও সব কেমন, খড়ের চাল, কেন্নোতে ভর্ত্তি, সেই সব কেন্নো ঝরে ঝরে পড়ছে ঘরের বাইরে, ভিতরে। বাচ্চাগুলোর নাক থেকে ঝরছে হলদে চাপ চাপ সর্দ্দি, হাতের উপর পাতা দিয়ে মুছে নিয়ে আবার খেলায় মত্ত ধুলো কাদা নিয়ে।

সেই গ্রামেই বাস রামসুন্দর কোটালের, তাদেরই মধ্যে যেন একটু অন্যরকম, একটু শিক্ষা ঘেঁসা।

সেই রামসুন্দরের জীবনটা চলছিল বেশ বহাল তবিয়তে। অন্যান্যদের মত কোনদিন পুরো খাবার, কোন দিন আধপেটা খেয়ে দিন গুজরান করতে হত না অথবা হাড়ভাঙা খাটনি খাটতে হত না। যে বেতনটা পেত তা যে খুব একটা কম তাও নয়। হাজার দেড়েকের কাছাকাছি। বেশীর ভাগ সময় কাটত পাখার তলায় কখনও আধো ঘুমে, কখনও আধো জেগে। প্রথম প্রথম ফাইফরমাস খাটত মাঝে মধ্যে। এখন আর তাও করতে হয় না, উল্টে রসিকতা করে সবাই তাকে ছোট বশ্ বলে। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে রামসুন্দর।

দেশের বর্ত্তমান রূপকাররা বলেন—সমগ্র দেশের মধ্যে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব সবচেয়ে কম, শিক্ষিতের হার সবচেয়ে বেশী।

কথাগুলো শুনে বা খবরে কাগজের বিবৃতি দেখে বেকাররা কষ্টকর হাসি হেসে বলে—এরপরে শুনব দেশে বেকারত্বটা ঠিক যেন টিকাকরণ শেষে গুটি বসন্ত নির্মূল হয়ে গেছে তেমনই বিদায় নিয়েছে।

সেটা হবে নব্বই সাল, হঠাৎ কানাঘুষো হল পঞ্চায়েত অফিসে "হোল টাইমার" দরকার। তারপর স্বচ্ছতা এবং সততার উদাহরণ স্বরূপ স্থানীয় পত্রিকাতে ছাপা হল খবরটা।

কথায় কথায় রঞ্জন বলে—একে তো পঞ্চায়েত অফিস তায় আবার পিওনের চাকরী। যাদের চাকর হব তারা সবাই যে লেখাপড়া জানা উচ্চশিক্ষিত তাও নয়। ওখানে এম. এ. পাশ অথচ বেকার বলে চাকরীতে যাওয়ার থেকে বাসে, ট্রেনে হকারবৃত্তি করা ঢের ভাল। বলতে তো পারব বেকারত্বের জ্বালায় পেট চালাতে এই পেশা বেছে নিয়েছি, চুরিও করিনি। গায়ে ছাপ লাগিয়ে নেতা হয়ে অন্যরকম রোজগারও করিনি।

রঞ্জনের আর্থিক দৈন্যদশা দেখে কথাটা বলেও ফ্যাসাদে পড়েছিল তার অভিন্ন হৃদয়

বন্ধু, বর্তমানে পঞ্চায়েত সদস্য শংকর বিশ্বাস। অবশ্য এই প্রথম, এই শেষবার, দ্বিতীয়বার কথাগুলো ভুলেও উচ্চারণ করার ধৃষ্টতা দেখায়নি।

হরিহরপুরের রামসুন্দর কোটাল কিভাবে যে ছিটকে বেরিয়ে গেল পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ভেঙে সেটা যেন সপ্তম আশ্চর্যের পরে অষ্টম আশ্চর্য।

লোকে বলে—কি রামসুন্দর পড়েছ কতদূর।

চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বেশ জোর দিয়ে বলে—ক্লাশ সিক্স।

কেউ কেউ বলে আর একটু তো পড়তে পারতে, তোমরা সিডিউল ক্লাস, চাকরী জুটে যেত একটা।

মিয়ানো গলায় রামসুন্দর কোটাল বলে—ইচ্ছে থাকলেই কি আর হয়ে যাবে, সংসার চালাবে কে, পেট কি কথা শুনবে?

রামসুন্দর লোকের বাড়ীতে রাখালের চাকরী করে, কিছুটা বড় হয়েছে এবার আধা মজুর।

আরও বড় হয়েছে সোমত্ত মজুর। বাড়ীর অভাবটা মিটেছে। দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছে, জুটছে নানা বয়সের নানা চরিত্রের বন্ধু ফুস মন্তর দেওয়ার মত কানে মন্ত্র ঢেলে দিয়েছে। মদ ধরেছে রামসুন্দর, তারপর মাতাল।

পাড়ার বৌদি রাণী জিজ্ঞাস করে—ঠাকুরপো বেশতো ছিলে আবার এসব নেশা ধরলে কেন?

মাতাল রামসুন্দর বেশ জোর দিয়ে বলে—

বেশ করেছি, আমি আমার গতর খাটিয়ে রোজগারের পয়সায় খাচ্ছি। তোমার কি।

আমার কিছু নয়—শুনেছি তোমার বাপঠাকুরদাদা কোনদিন বিড়ি, পান, মদ খায়নি। তুমি খাচ্ছতো তাই দেখতে খারাপ লাগছে।

তুমি কি আমাকে দেখ, যে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নাকি তোমার নাকে শরীরে আমার খাওয়া মদের গন্ধ লেগে যাচ্ছে?

কেন? তোমার শরীরে কি এমন মাহাত্ম আছে যে আমি শরীর ঘষে মদের গন্ধ ঢেলে নেব।

ভালবাসত রাণী বৌদি, তাই বাধা দিয়েছিল। বিনিময়ে যা শুনতে হল, তারপরেও কি কেউ বাধা দেবে নাকি দেওয়া উচিৎ। রাণী বৌদি বলেছিল—তুমি মরে গেলেও আর কোন দিন বলব না। এই মায়ের দিব্যি কেটে বললাম।

রাণীর বিয়ে হয়েছে বেশ কিছুদিন। হরিহরপুরের হতশ্রী পাড়ায় যেন গোবরে পদ্ম ফুল ফুটেছে, হলে কি হবে আজও বাচ্চা কাচ্চা হল না, হাত ভর্ত্তি তাবিজ, আঙ্গুল ভর্ত্তি যে যেমন বলেছে—এক ধাতু থেকে অষ্ট ধাতুর আংটি। ভারই বয়ে চলেছে। পেট ভারি আর

হল না, যখন সুস্থ থাকত, রামসুন্দর বলত—না বৌদি দাদার দ্বারায় আর হবে না, এবার লোক দেখতে হবে। রাণী চোখ দুটোকে ছোট করে সমস্ত শরীরে অদ্ভুত এক মাদকতা এনে বলত— লোক খুঁজতে হবে কেন, কাছেই তো একটা ষাঁড় দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর জিভ বের করে ভেঙচি কেটে ছুটে পালাত কলা গাছের আড়ালে ঘরটায়। রামসুন্দর দেখত রাণী বৌদিকে। ব্যস এই পর্যন্তই।

হয়তো রং লেগেছিল রামসুন্দরের মনে কিন্তু সাহস পায় নি কোনদিন, আর পাবেই বা কি করে, তার শরীরের জোয়ারে ভাসবে বলে সন্ধ্যেবেলায় এসেছিল পাশের গাঁয়ের জিতেন, যার বাড়ীতে কাজ করত রাণীর বর হরি।

মধ্যবিত্ত বাড়ীর লেখাপড়া জানা জিতেন, যখন তখন ডাকতে যেত হরিকে, কথা বলত, নানান রসের গল্প হত রাণীর, জিতেনের। জিতেন ভেবেছিল রাণীর মন গলেছে। সন্ধ্যেবেলায় ডাক দিল জিতেন—

ও রাণী বৌদি—হরিদা আছে?

কে?

আমি জিতেন।

না সে তো নেই।

কোথায় গেছে?

তোমাদের গাঁয়েই তো গেছে।

কই দেখলাম না তো।

কে জানে বাবা কখন যে কোথায় যায়, রামসুন্দরের সাথে যদুপুরে মদ খেতে গেছে নাকি তাই বা কে জানে।

না তাহলে চলে যাই, দেখি কোথায় পাওয়া যায়।

চলে যাবে, আসবে না?

ডাকলে কোথায় যে আসব।

এইতো ডাকলাম।

তবে আসি।

দুজনে কত গল্প, গল্পের সুর বদলাতে বদলাতে কোন বৌদি কার সাথে আছে, কোন দাদা কার বৌদির সাথে আছে এই সব নানান প্ররোচনা, তারপর আসল কথা।

বুঝলে রাণী বৌদি, আমি হলে না তোমার বাচ্চা হয়ে যেত।

তাই নাকি?

তা তুমি বিয়ে করে তাড়াতাড়ী বাচ্চা তৈরী করে ফেলনা দেখি।

আরও দু এক কথা বলতে বলতে রাণীকে জড়িয়ে ধরে যেমনি না তার স্তনে হাত

দিয়েছে অমনি রাণী তার গালে মেরেছে এক চড়, তারপর তাকে ছাড়িয়ে সামনে ছিল ঝাঁটা—

এইজন্যেই এত খোঁজখবর, ঘুরঘুরাণী, আজ ঝাঁটায় বিষ ঝেড়ে দেব।

পড়িমরি করে জিতেন তো পগার পার।

রাণী বৌদির কাছে সবকিছু শুনেছিল রামসুন্দর, ভয়ে কোনদিন তার কাছে এই মানসিকতা নিয়ে যাওয়ার ধৃষ্টতা সে দেখায় নি।

কিন্তু মন—তাকে তো আটকে রাখা কঠিন।

প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় মদ খেতে যেত রামসুন্দর যদুপুরের শুকদেবের ভাটিখানায়। যেখানে দাদাকে সাহায্য করত তার বিধবা বোন সরমা। দোকানটা চলছেও বেশ রমরমিয়ে।

অন্যান্য দিনের মত বেমক্কা মদ রামসুন্দর সেদিন খায়নি। মন ভরে দেখেছে সরমাকে।

রহিম চাচা, সবাই তাকে তাই বলেই ডাকে। তার আসল নাম শেখ রহিমউদ্দিন কালাম। লম্বা চওড়া, সাদা দাঁড়িতে মুখ তার ভরন্ত, মাথার চুলগুলোও কাশ ফুলের মত সাদা। শিক্ষিত, স্বজ্জন, আর্থিক অবস্থা কোনকালেই বিরাট কিছু ছিল না, এখনও নেই। সবাই বলে এই ডামাডোলের বাজারে চুনোপুঁটিরা রুই, কাতলা, কেউ কেউ হাঙ্গরও হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রহিম চাচা রয়ে গেল আগের মতই। তা হোক, সবাই বলে মানুষটাকে দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে যায়। তিনি সেই কবে থেকে পার্টী সদস্য পদ পেয়েছেন, আজও রয়েছে। বর্তমানে তিনি এলাকার উপপ্রধান।

সেদিন রাত্রি এগারটা কি সাড়ে এগারটা হবে, রহিম চাচা ফিরছেন মিটিং সেরে। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলেন—বল শালা বল, আর বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াবি, শালা নবাব পুত্র হয়েছেন, ম্যাগনায় খাবে আবার ফুসলিয়ে নিয়ে পালাবে।

আর একজন চিৎকার করে বলে উঠল—মেরে দাও, একবারে মেরে দাও। ছোটলোকের ঘোড়া রোগ ধরেছে।

একজন তো তার পেটে বুকে সমানে লাথি মারছে কষে।

একটি শেষ মধ্য বয়স্কা মহিলার কান্না ভরা ওগো তোমরা কে কোথায় আছো বাঁচাও, আমার ছেলেটাকে সবাই যে মেরে দিল'' চিৎকার ভেসে আসছে রহিম চারার কানে।

এত মার খাচ্ছে অথচ ছেলেটা কোন প্রতিরোধ গড়ছে না, দাঁড়িয়ে শুকদেবের হাত থেকে কাল তেল চক্চকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালে জনমানব শূন্য হয়ে যাবে মুহূর্তের মধ্যে। কেবল বলে চলেছে—মারো আরও মার, তোমাদের যতক্ষণ ইচ্ছে যায়। আমি সরমাকে ঠকাতে চাই নি, ওর ক্ষতি করতে চাই নি, ওকে ভালবেসে বিয়ে করব বলে যা কিছু করেছি।

সমস্ত শরীর ফেটে রক্ত ঝরছে ছেলেটার।

রহিমচাচা তার বাজখাঁই গলায় চিৎকার করে ওঠে। কি হচ্ছে কি, তারপর দ্রুত কাছে এসে বলে—তোমরা কি ছেলেটাকে মেরে ফেলবে ভেবেছ। বন্ধ কর সব।

ভূত দেখার মত থমকে দাঁড়িয়েছে শুকদেব। বন্ধ হয়েছে মার। জমায়েত পাতলা হচ্ছে খুব দ্রুতগতিতে, ছেলেটার গায়ে হাত রেখে রহিমচাচা স্বভাবসিদ্ধ গলায় বলেন—তোরা তো মানুষ, মানুষ হয়ে আরেকটা মানুষকে এভাবে লাঠি পেটা করছিস্ ওর কষ্ট হয় না। তোদের মায়া হয় না, তোরা যা করলি পারবি তার ক্ষতি পূরণ দিতে।

মুখে কারও কোন শব্দ নেই, শব্দ নেই শেষ চৈত্রের গাছে পাতা নড়ার। চাঁদটাও আকাশে নেই, অথচ কিছুক্ষণ আগে তাকিয়েছিল রামসুন্দরের দিকে, তখনকার চোখে মুখে ছিল অদ্ভুত মায়া, সে যেন তার সাদা সাদা হাত দুটি বাড়িয়ে বুলিয়ে দিচ্ছিল তার শরীরে। হয়তো সেই জন্যই অজস্র প্রহারেও, অজস্র রক্তক্ষরণেও রামসুন্দর ছিল নির্বিকার। তার কাজ হয়তো শেষ তাই সে চলে গেছে মেঘের আড়ালে। বাতাসও বইছে না তেমন করে। সবকিছু থমথমে। থমথমে রহিমচাচার মুখ, কপালের শিরাগুলো দেখা যাচ্ছে জমে যাওয়া মেয়েদের কুপির আলোয়। হঠাৎ সবাইকে অবাক করে পশ্চিমের বাঁশ বাগানে ডেকে উঠল কয়েকটা শৃগাল। তারা আস্তানা করে আছে ঐ বাঁশ বাগানেই বহুদিন থেকে, বোধহয় শিকারে বেরুবে বলে ডেকে নিচ্ছে সবাইকে। তারপর সব চুপচাপ।

রহিম চাচার নির্বাক থম্‌থমে মুখটা নড়ে উঠল, চোখের আগুন জ্বলছিল কিছুক্ষণ আগেও, এখন স্বাভাবিক, জিজ্ঞাসা করলেন শুকদেবকে রামসুন্দর কি করেছিল?

ভয়টা যেন কাটতে চাইছে না শুকদেবের, না জানি কি কোপে পড়তে হবে। উত্তর না দিলে সমুহ বিপদ ভয়। ভয় গলায় বলল—কি করেছে জানেন?

তাইতো জানতে চাইছি?

আমতা আমতা করে শুকদেব বলল—জানেন, রামসুন্দর আমার বিধবা বোনটাকে ফুসলিয়ে এনে তার ইজ্জৎ নষ্ট করেছে।

ধমকের সুরে রহিম চাচা জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি যা বলছ সব সত্যি তো?

সত্যি নয়তো কি মিথ্যা বলছি। তারপর সরমার দিকে তাকিয়ে, আবার রহিম চাচার দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে বলল—ঐ তো সরমা দাঁড়িয়ে আছে ওকে জিজ্ঞাসা করুন না।

রহিম চাচা সরমাকে সস্নেহে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নাম সরমা?

লজ্জাবনত হয়ে বলল—হ্যাঁ আমি সরমা, শুকদেব আমার দাদা।

তোমার দাদা যা বলল তাকি ঠিক?

সরমার চোখ তখন মাটির দিকে, চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল নিজেরই পায়ে।

আরও স্নেহ মাখা গলায় রহিম চাচা জিজ্ঞাসা করলেন—কি কোন উত্তর দিচ্ছ না যে?

ভয়টা যেন আবার ভর করল শুকদেবের মনে, সে ভেবেছিল সরমা সমর্থন করবে তাকে, মিয়ানো গলায় বলল—কি উত্তর দেবে বলুনতো চাচা, নিজের ইজ্জৎ যাওয়ার কথা কি কোন মেয়ে সবার সামনে বলতে পারে।

রহিম চাচা যা বোঝবার বুঝে নিয়ে বললেন—তোমরা সব বাড়ী যাও, আমি দেখছি কি করা যায়।

যেন সাহস পেল শুকদেব, গলার আওয়াজ একটু বাড়িয়ে বলল এমন কিছু করুন ও যেন জীবনে কোনদিন এমন কাজ করার সাহস না পায়।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে রহিম চাচা শুকদেবের জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মদের দোকান আছে, তাইনা শুকদেব?

আজ্ঞে, তেমন কিছু নয়, বুঝতেই তো পারছেন, সংসারটাতো চালাতে হবে।

হঠাৎ গলাটা চড়ে গেল রহিম চাচার—তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, সাত দিনের মধ্যে ব্যবসা বন্ধ না করলে, পুলিশ ডেকে তোমাকে শ্রীঘরে ঢুকিয়ে দেব।

ভয়ে, মাত্রাতিরিক্ত বিনয়ে জোড় হতে করে শুকদেব অনুরোধ করল বাবু এমন কাজ করবেন না। এটা বন্ধ হয়ে গেলে আমরা না খেতে পেয়ে প্রাণে মরে যাব।

অন্য কিছু করবে।

এই বয়সে কি করব বাবু?

সে আমি কি করে বলব, আর একটা কথা তোমার বিধবা বোন সরমাকে একবার পঞ্চায়েত অফিসে পাঠিয়ে দেবে।

কেন বাবু?

তোমার তো সব কিছু জানার দরকার নেই।

একরাশ হতাশা নিয়ে মাথা চুলকাতে চুলকাতে চলে গেছে শুকদেব। সরমা চলে গেছে দাদার পিছনে পিছনে।

রহিম চাচা শুধু উপপ্রধান হিসেবে নয়, অথবা ঘটনাচক্রে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাওয়ার জন্য নয়, পিতার ভূমিকায় জিজ্ঞাসা করেন—

তুমি তো রামসুন্দর?

হ্যাঁ বাবু।

তোমাকে তো সচরাচর এখানে দেখি না, তারপর যেন স্বগতোক্তির মত বলেন—দেখবই বা কি করে, হরিহরপুরের সাথে যোগাযোগটাই বা কোথায়!

রামসুন্দর সবিনয়ে বলে—এখানেই আমার বাড়ী, আগে বাইরে থাকতাম, তারপর চলে আসি গ্রামে, অবশ্য গত দু বৎসর এখানে ছিলাম না।

কোথায় ছিলে?

এখানে তো কাজ নেই তাই রূপনারায়ণের ধারে কোলাঘাটে গিয়েছিলাম কাজ করতে।

অবাক দৃষ্টিতে রহিম চাচা দেখছেন রামসুন্দরকে। কথাগুলো লেখা পড়া জানা মানুষের মত সাজানো। জিজ্ঞাসা করেন—তুমি লেখাপড়া জানো?

যেন লজ্জা পেয়ে যায় রামসুন্দর অথচ তার ছোট্টবেলায় কেউ জিজ্ঞাসা করলে শরীর ঝাঁকিয়ে বেশ কায়দা করে বলত ক্লাস সিক্স। সেই রামসুন্দর বড় হয়েছে। সোজা কথা ভরন্ত যুবক হয়েছে। লেখাপড়া বেশী না শেখার ফলও সে পেয়েছে, সে দেখেছে কোলাঘাটের রাজু দাস মুচি সম্প্রদায়ের হয়েও অনেকদূর পড়ে মাষ্টারী করছে স্কুলে। অথচ সে সুযোগ পেয়েছিল, ছোটবেলায় যখন এই কোলাঘাটেই রাখাল ছিল নরনারায়ণবাবুর বাড়ীতে, সবাই বলেছিল পড়তে, কিন্তু কে কার কথা শোনে, সেই লজ্জায় মুখ নিচু করে বলে—ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়াশুনা করে আর পড়া হয়ে ওঠেনি।

কেন?

বাবা মারা গেল বলে, তার ইচ্ছা ছিল আমাকে পড়াবে। কোন কাজ করতে দিত না, পাড়ায় সবাই হাসি ঠাট্টা করত আর বলত রতনা কোটালের ভিমরতি ধরেছে, লেখাপড়া শিখিয়ে বেটাকে চাকরী করাবে। কথায় বলে না পেটে নাই ভাত নাঙের উৎপাৎ', করার ইচ্ছাও চলে গেল মরে যাওয়ার সাথে সাথে।

তোমরাতো সিডিউল ক্লাস, অনেক রকম সরকারি সহযোগীতা পেতে পারতে।

হয়তো পেতাম, কিন্তু পেট, সে তো কারও কথা শুনে না। তারপরে, একজন ভদ্রলোক যদুপুরে স্কুল শিক্ষক আমাকে চিনতেন ঐ স্কুলে পড়ার সুবাদে। তার বাড়ীও কোলাঘাটে একদিন বললেন রামসুন্দর, তুমি তো লেখাপড়া শিখলে না, আমাদের বাড়ী চল ওখানে কাজ করবে, যা মাইনে পাবে তা খুব একটা নয় সেটা পাঠিয়ে দেবে বাড়ীতে।

তারপর?

আমার তখন ভয়ে পরান পাখী যায় যায়, কোথা হরিহরপুর কোথা কোলাঘাট যেন পৃথিবীর এ প্রান্ত ওপ্রান্ত তবুও গেলাম। গিয়ে দেখলাম কাজ কোথায়। এতো বাজার করা আর ঘর আগলানো। জানেন বাবু। নরনারায়ণ বাবুর এক ছেলে এক মেয়ে আমাকে দুবেলা পড়াত, প্রতিদিন রূপনারায়ণের কাছে নিয়ে যেত, দেখতাম ভরা কোটাল মরা কোটাল, জল উঠছে ফুলে ফুলে—যৌবনে উন্মাদনার মত, উন্মাদনার নিরসনে শান্ত হয়ে যাওয়ার মত। যেমন আজ আমার ভরা কোটালে মরা কোটাল।

হঠাৎ রহিম চাচা রামসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করে—রামসুন্দর শুকদেব যা বলে গেল সেটা কি ঠিক?

শুনবেন বাবু? বাবা মারা গেল, তখন আমার বয়েস বড়জোর তের, বোন সাত। আমি গেলাম কোলাঘাট, মা লোকের বাড়ীতে এটা ওটা করে যা আসত সংসারটা চলছে কোন

রকমে। দিন চলে বোন বড় হয়। বোনের বয়স তখন চৌদ্দ আমি কুড়ি, গোপালপুর থেকে পাত্র এল, তার মা বাবা এলেন। বোনকে পছন্দ হল। কথাবার্ত্তা হল। একদিন বিয়েও হয়ে গেল। বাচ্চা হল তিন বৎসর অন্তর দুটি। সে আসে যায়। গা ভর্ত্তি গয়না, মানি ব্যাগ ভর্ত্তি টাকা, আসলেই টাকা দিয়ে যায় অনেক, সেই টাকা পেয়ে পেয়ে কাজের ইচ্ছেটা চলে গেল একবারে। যেমন আজকের গরীবরা না চাইতেই পেয়ে পেয়ে ফাঁকিবাজী শিখেছে। কেউ কেউ মদ, মেয়ে ছেলে নিয়ে বিপথে চলে যাচ্ছে। সেইরকমই হল আমার অবস্থা, টাকা থাকলে বন্ধু জুটে। বন্ধু জুটল, মদ ধরলাম। এখানে মদের ভাটি মানে শুকদেবের ঘর।

তুমি ওখানে নিয়মিত যেতে?

মদ খেতে হলে যাব কোথায়, এটিই তো একমাত্র দোকান।

তারপর?

ওখানে পরিচয় হল শুকদেবের বিধবা বোনের সাথে সে তার জীবনের সবকিছু কথা বলেছিল।

কি বলেছিল?

একটু যেন জিরিয়ে নেয় রামসুন্দর, তার শরীরের ক্ষতে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছেন রহিম চাচা, হলে কি হবে যন্ত্রণা তো এত তাড়াতাড়ি কমবে না, সামনে রাখা প্লাস্টিকের মগ থেকে একটু জল খেয়ে—সরমা বলেছিল "আমার বয়স তখন ষোল সতের, শরীরে বান ডেকেছে, স্বামীর সোহাগ খেয়ে খেয়ে। হঠাৎ লোকটার জ্বর এল রাত তখন বারটা, জ্বর বাড়ে, কোন ডাক্তার কাছে পিঠে নেই যে ডাকব। ঘরেও কেউ নেই, শশুর-শাশুড়ী গেছে তাদের মেয়ের বাড়ী। এত রাতে দূর গাঁয়ে ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে বাড়ীতে এসে দেখি লোকটা মরে পড়ে আছে। খবর রটল গোটা গাঁয়ে আমি নাকি তাকে মেরে দিয়েছি। অসুচী শেষ হওয়ার আগেই আমাকে তাড়িয়ে দিল ঘর থেকে, চড়লাম দাদার ঘাড়ে। প্রথম প্রথম দাদা বৌদি যত্ন করত খুব। তারপর আরম্ভ হল অত্যাচার, ভাটি খানাতেও মন্দা বৌদির বুদ্ধিতে আমাকে বসিয়েছিল ভাটি খানাতে। রমরমিয়ে চলতে লাগল ভাটিখানা, বৌদির বুদ্ধিতে দাদা আমাকে ভাটিখানার পাশে একটা ঝাঁটি বেড়ার ঘর করে দিল। কোন কোন দিন দাদা বেশ মালদার পার্টি ধরে, রেখে দিত সমস্ত রাত আমার ঘরে। প্রতিবাদ করলে জুটত তেল চক্‌চকে কালো বাঁশের লাঠির মার। ফুলে যেত সমস্ত শরীর, তারপর শুরু হত খদ্দেরের অত্যাচার, পরে সব সয়ে গেছে।" জানেন বাবু সব কিছু শুনে সরমার প্রতি কেমন মায়া হল, সেখান থেকে জন্মাল ভালবাসা, দুজন দুজনকে ছাড়া থাকতে পারতাম না। সরমাও কোন খদ্দেরকে পাত্তা দিত না।

তখন তোমরা কি শারীরিক ভাবে মিলিত হতে?

না বাবু, ওসব কিছু হয় নি। তবে...............

তারপর?

এইভাবেই চলছিল বেশ কয়েক বৎসর। হ্যাঁ হবে দু বৎসর তো বটেই।

তারপর?

কে বা কারা বনাই রমেশকে খুন করে লরির চাকার তলায় ফেলে দিয়ে গেল, আর আমার বাড়ল দায়িত্ব, এখানে তো সারা বৎসর কাজ নেই, চলে গেলাম বাইরে। বোনের যা কিছু ছিল সব শেষ হয়ে গেল, তারা খাবে কি?

ফিরে এলে কেন?

ভাগনে দুটোর জন্য মন খারাপ করছিল, তাছাড়া শুনলাম শোকে দুঃখে মরে গেল রমেশের বাবা, মা, বোনের ঘরে ঢুকবে বলে অনেক লোকের আনাগোনা, তাকে তো দেখতে হবে।

এখানে তো রোজগার কম বলে বললে।

ঐ কম রোজগারেই পাঁচটা পেট চলে যেত কোন রকমে।

তারপর?

যা হয় আরকি—দূরে থাকলে মনে থাকে না, কাছে আসলে টান বাড়ে, ফিরে গেলাম ভাটিখানায়।

আবার মদ ধরলে?

না তেমন আর খেতাম না, পাবই বা কোথায়।

এসে সরমার সাথে আবার যোগাযোগ করলে?

জানেন বাবু দেখে তো অবাক! সরমা দু বছরে বেশ ডাঁসা হয়েছে। সাদা থান ছেড়ে পরেছে রঙীন শাড়ী, হাতে কনুই পর্যন্ত কাঁচের চুঁড়ি, পায়ে রূপার মল, শুনলাম প্রতি রাতেই নানা বয়সের বাবু আসে, রাত্রি কাটায়, ভোগবিলাস সেরে ভোরের আকাশ পরিষ্কার হওয়ার আগে চলে যায়, সঙ্গে যা আনত, মায় ঘড়ি, আংটি জমা পড়ে যেত শুকদেবের ঘরে।

তুমি কি তাকে নতুন করে আবার প্রস্তাব দিলে?

না বাবু আমাকে দিতে হয় নি, সরমা কেঁদেই আকুল বলে "আমাকে নিয়ে চল রামসুন্দর, আমার ভাল লাগছে না।"

তারপর?

শুকদেব দু একদিন দেখার পর বলতে শুরু করল—রামের সাথে এত কিসের গল্প, বাবুরা সব ফিরে যাচ্ছে। রাম তোকে কিছু দেবে? যা যা ঘরে যা, বাবু আসছে।

সেই প্রথমবার সরমা প্রতিবাদ করেছিল। কেননা তার মনে তখন স্বপ্নে ভাসছে নতুন একটা ঘর বাঁধার, ভাল লাগছে না এই ব্যবসায়ীক জীবন, যেখানে হৃদয়ের উত্তাপ নেই, কেবল সেই সব পুরুষের বিকৃত মনগুলোকে শান্ত করার, যারা বোতলের পর বোতল মদ খেয়ে আসত তার ঘরে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত শরীরের সব কিছু।

সরমা হাঁপিয়ে উঠেছিল, সরমা খুঁজছিল জীবনের নির্ভরতা, আস্থা, হঠাৎ বলে বসল—রামসুন্দর তুমি পারবে না আমাকে এখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে।

তুমি যাবে সরমা!

চোখে জল দেখেছিলাম সরমার, বলেছিল—যাব, যাব রামসুন্দর, যেখানে শুকদেবের মত দাদার ছায়াও থাকবে না, কেবল তুমি আর আমি।

কয়েকটা লোক তখন আকণ্ঠ পান করছে ভাটিখানায়, তার মধ্যে একজনের সাথে কথা বলছিল শুকদেব, হয়তো সেই হবে সে দিনের জন্য সরমার খদ্দের। মুখ তুলে চিৎকার করল শুকদেব—কি হল, শুনতে পাচ্ছিস্ না?

সরমা জানে কথা না শুনলে তার ভয়ানক পরিণতির কথা, সে বলে—রামসুন্দর তুমি মাঝরাত্রিতে এস, আরও অনেক কথা আছে।

বললাম বাবুরা থাকলে কি করে কথা বলবে?

সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

ফিরে এলাম বাড়ী, জানেন বাবু সে রাত্রিতে ঘুমাতে পারিনি।

কেন?

নতুন স্বপ্নের রেশে। সরমাকে সত্যিই এবার পেতে চলেছি সেই উত্তেজনায়, সরমার হৃদয় থেকে উৎসারিত কথাগুলির অনুরনন হচ্ছিল মনের মধ্যে, ঘরের চার দেওয়াল থেকে।

তুমি গেছলে?

গেছলে নয়, যেতাম। সরমা বিভিন্ন আছিলায় তাড়িয়ে দিত খদ্দেরদের এবং ভয় দেখাত আমাকে দেখিয়ে। বলত "এই যে একে দেখছ তোমাদের খুন করে দেবে ইত্যাদি", সব দিন নতুন নতুন লোক, যারা একবার এসেছে সব হারিয়ে চলে গেলে ভুলেও আর দ্বিতীয়বার আসতনা। স্বাভাবিকভাবেই চিনত না আমাকে, প্রাণের ভয়ে চলে যেত রাতের অন্ধকারে। শুকদেব জানতেও পারত না, অথবা এমন ভয় দেখানো হত সাহস ছিল না শুকদেবকে কিছু বলার।

তারপর?

তারপর যা হয়। ও আদরে ভরিয়ে দিত আমাকে, আমিও মত্য ষাঁড় হয়ে যেতাম, সরমা যেন এমনটাই চেয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন একটি প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল।

কি?

আমার মদ খাওয়া চলবে না, খেলেও যেটুকু প্রয়োজন সে নিজে সেটুকু খাওয়াবে।

তারপর?

একদিন রাত্রিতে আমরা তখন মত্ত হয়ে গেছি, সরমা আমার পুরষাঙ্গ নিয়ে যেন খেলা করছে বাচ্চা ছেলের মত। শুকদেব এসে হাজির। সরমার দরজার বাইরে থেকে ডাক দিল সরমা দরজা খোল।

ভয়ে কুঁকড়ে গেছল সরমা, শুধু বলেছিল সামনের বুধবার তুমি রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করবে, আমি পৌঁছে যাব।

ঘর খুলে দিল সরমা, তখনও আমি সেই ঘরের মধ্যে, কালো তেল চক্‌চকে লাঠিটা নিয়ে সরমার শরীরে আঘাত করতে লাগল আর যতসব বাজে ভাষায় গালিগালাজ দিতে লাগ্‌ল। বিশ্বাস করুন বাবু আমরা ছোটলোক হতে পারি কিন্তু নিজের বোনকে ঐ ভাষায় গালিগালাজ অথবা এমন নোংরা কাজে ঠেলে দিতে পারব না কোনদিন।

আজ সেই বুধবার, অনেক দিনের সযত্নে লালিত ইচ্ছা পূরণের আনন্দে দুজনেই তখন বিভোর, দুজনেই তখন লাগাম ছাড়া।

তুমি সরমাকে বেছে নিলে কেন? সে যে পথের পথিক, তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে, আশাটা কি বাতুলতা নয়।

আমিও তো দিন রাত্রি আকণ্ঠ মদ খেতাম, আমারও জীবনে তো অনেক অন্ধকার দিক ছিল, আমি তো সব ছাড়তে পেরেছি। সরমা তো ঐ ধরণের জীবন কখনও চায় নি, সে তো বাধ্য হয়ে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ পথ ধরেছিল।

ওরা যে বলল তুমি সরমার ইজ্জৎ নিচ্ছিলে।

হ্যাঁ বাবু, সত্যি কথা বলছি আমি আর সরমা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছলাম। আমি তখন যেন বজ্র হয়ে গেছি, সে যেন পৃথিবী হয়ে উপভোগ করছে বজ্রের থেকে উৎসারিত আগুনের ঝলক। কারও খেয়াল ছিল না পৃথিবীতে মানুষগুলো আছে, যখন দুজন দুজনকে শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি সেরে ছাড়লাম, দেখি অসংখ্য লোক আমাদের কাছে, চারিদিকে।

তারপর?

তারপর আপনি যা দেখলেন। যা এখন দেখছেন।

কিন্তু সরমাতো কিছু বলল না।

সরমা প্রতিবাদ করলে ওর দশাও একই হত। আপনি বলুন তো একটি নারীকে একজন পুরুষ পারবে মুখ বন্ধ করে চুপচাপ ফেলে রাখতে, যদি তার ইচ্ছা না থাকে।

সরমা কি সত্যিই তোমাকে ভালবাসে।

ওকে তো ডেকে পাঠিয়েছেন, জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবেন।

রাত্রি বাড়ছে ধীরে ধীরে, গোটা গ্রাম শুনশান, রামসুন্দরের মা আর রাণী বৌদি ছাড়া। এবার চলে যেতে হবে রহিম চাচাকে, যাওয়ার আগে রামসুন্দরকে বললেন—আমার কাছে বিশেষ কিছু নেই, এই পঞ্চাশটা টাকা রেখে দাও, চিকিৎসা করাবে। যদি আর প্রয়োজন হয় বলবে, সঙ্কোচের কারণ নেই।

লোকারণ্য পঞ্চায়েত অফিস্‌, কোন মুখরচোখ কিছু ঘটলে যেমন হয়। ব্যাপারটাতো রটে গেছে সমস্ত এলাকায়। সরমাকে এক ঝলক সবাই দেখতে চায়।

সরমার সমস্ত চোখে মুখে রাত্রি জাগার ছাপ, হয়তো মারও খেয়েছে শুকদেবের কাছে। শাস্তি করবে না তো কি, সে তো সোনার ডিম দেওয়া হাঁস। যদি সে হাঁস চলে যায় মালিকের রাগ তো হবেই।

সময়টা হবে বিকেল, ফুরফুরে হাওয়া বইছে নতুন বৎসরের। মেহগনী, রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, রংবেরঙের গোলাপ গাছে সাজানো পঞ্চায়েত অফিস, তারিফ করতে হয় রহিম চাচার রুচির। মন ভরে যাওয়ার মত পরিবেশ। ছায়া মাথায় নিয়ে সরমা এসেছে রহিম চাচার নির্দিষ্ট ঘরে। রহিম চাচার নির্দেশেই বসেছে মুখোমুখি। কোনরকম ভূমিকা না করেই রহিম চাচা সরমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি রামসুন্দরকে ভালবাস?

লজ্জা বশত মুখ উস্কো খুস্কো চুল অথচ ভেতরে ভেতরে যেন কঠিন দৃঢ়তা। সরমা উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

রহিম চাচা গলার স্বরকে যথাসম্ভব নামিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন আচ্ছা মা, তুমি রামসুন্দরের সাথে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলে?

একই ভঙ্গীমায় উত্তর দেয় সরমা—হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

জ্বলে ওঠে সরমা, ঠিক যেন কালো কালো মেঘে ঢাকা আকাশ থেকে বজ্রের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত, যা কোনভাবেই প্রত্যাশা করতে পারেন নি রহিম চাচা—দেখবেন কেন?

আবার মুখ নামিয়ে নেয় সরমা আপনি আমার বাবার মত, মায়ের অনুপস্থিতিতে বাবা-মা একই, মেয়ে হয়ে সবকিছু বলার, দেখানোর অধিকার আমার আছে যদি আপনি অভয় দেন ....

বলনা।

বলবনা কেবল দেখাব—ব্লাউস খুলে ফেলে সরমা, তার চোখ থেকে তখন জল ঝরে পড়ছে দু গাল বেয়ে। দেখুন কি অবস্থা করেছে আমার দাদা, এই দেখুন দাদা যাদের কাছ থেকে রোজগার করে তাদের দাঁতের দাগ এখনও ঠিক মত শুকিয়ে যায় নি।

মাথা নিচু হয়ে গেছে রহিম চাচার, তার ভাবনায় কোন দিন আসে নি একটি মেয়ে এইভাবে অত্যাচারিত হতে পারে তারই সহোদর ভাইয়ের কাছে। সস্নেহে বলেন সব পরে নাও মা, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

সরমা বলতে চায় সবকিছু, তাকে বলতেই হবে, অর্থের লোভ মানুষকে সে যদি ভাই হয়, সে যদি স্বামী হয় কিভাবে ব্যবহার করতে পারে নিজের বোনকে, নিজের অগ্নিস্বাক্ষী করে বিয়ে করে আনা স্ত্রীকে। জানেন বাবু প্রতি রাত্রে কোনদিন একজন, কোন দিন দুজন, এক আধ দিন তিনজন লোককে মদ খাইয়ে তাদের স্বর্বস্বান্ত করে পাঠিয়ে দিত আমার ঘরে। তার আগে সাবধান করে দিত কোন প্রতিবাদ করলে তার ফল হবে ভয়ানক। বৌদিকে

বললে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে ঢুকিয়ে দিত আমার জন্য আলাদা করে তৈরী কর দরমার দরজা ঝিটে বেড়ার ঘরে। বাইরের দিকে লাগিয়ে দিত চাবি, ইচ্ছে করলে সে দরজা ভেঙে দেওয়া যেত, বদলে যা সহ্য করতে হত তা বলা যাবে না।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

আর শুনবেন?

আর শুনতে চাই না।

ভাল লাগছে না তাই না। তাহলেই ভাবুন এই সব অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য কেউ যদি হাত বাড়ায়, তার ডাকে সাড়া দেওয়া কি অপরাধ।

সেদিন তুমি বললে না কেন?

বললে বিপদটা আসত অন্যদিক থেকে।

কি বলবেন রহিম চাচা, কাকে বলবেন রহিম চাচা, তার নিজের হৃদয়টাই তো ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে নেই তবুও সরমাকে বললেন, তুমি বাড়ী যাও, দেখি কি করা যায়।

শান্ত, সবার প্রিয় মানুষটার মাথায় যেন খুন চড়ে গেছে। সেইদিনই জরুরী মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাতের অন্ধকারে শুকদেবের ভাটিখানা ভেঙে দিয়েছেন পুলিশ দিয়ে। উঠতি পার্টী সদস্যরা বাধা দিয়েছিল এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। কেন? কেবল তারাই জানে।

শুকদেব বার বার হাতে পায়ে ধরেছিল রহিম চাচার, শুকদেবের বৌ কেঁদেছিল সুর করে, গলাতে পারেনি রহিম চাচাকে, সে তখন যেন নটরাজ, কাঁপছে সমস্ত এলাকা, কেউ কেউ বলছে রহিম চাচাকে এইভাবে রেগে যেতে তারা কখনও দেখেনি।

রামসুন্দরকে চাকরী দিয়েছে রহিম চাচা অবশ্য সবার সাথে আলোচনায় সিদ্ধান্ত ক্রমে। রামসুন্দর এখন পঞ্চায়েত অফিসের পিওন। সবাই তাকে মজা করে বলে ছোট বশ্।

বোনের মুখে হাসি ফুটেছে, যে দেড় হাজার টাকা বেতন পায় সবটাই তুলে দেয় মায়ের হাতে, সেই টাকা থেকে রামসুন্দরের অনুরোধে এক হাজার টাকা তুলে দেয় বোন রিম্পাকে। অনেক হালকা লাগছে রামসুন্দরের। বুকে জমে থাকা ব্যাথাগুলো যেন নেমে যাচ্ছে একটি একটি করে। ভাগনে দুটো পেট ভরে খেতে পাচ্ছে। দুটো জামা প্যান্ট দিতে পারছে।

নির্বাচন হয়ে গেল ধুমধাম করে, পঞ্চায়েত নির্বাচন, মানুষের আশার পতিফলন হয়েছে নির্বাচনে। প্রত্যাশিত ভাবেই বিরোধীপক্ষ জিততে পারে নি। কে কি চেয়েছিল কে জানে রামসুন্দর অন্তত মনে প্রাণে চেয়েছিল রহিম চাচার দল জিতুক, ওরা মানুষের বিপদে আপদে পাশে থাকে, অন্যায়কারীকে কঠোর হয়ে সাজা দেয়। এবারের নির্বাচনের শেষে রহিম চাচা

উপপ্রধান থেকে প্রধান হয়েছেন। গ্রামে গ্রামে চলছে উন্নয়নের বান। দায়ীত্ব বহুগুন বেড়েছে রহিম চাচার, সংগঠন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথী হওয়া, গ্রামেগঞ্জে গন্ডগোল হলে তার সমাধান করা, সেল্ফ হেল্ফ গ্রুপ পরিচালনা করা।

তখন শেষ জৈষ্ঠের দুপুর। তাপপ্রবাহ চলছে বাংলার মাঠে মাঠে, গাছের পাতাগুলোও চিতল মাছের মত তাদের পেট দেখাচ্ছে সবাইকে। গোটা গ্রাম শুনশান রহিম চাচাকে যেতে হবে যেখানে কর্মহীন মানুষগুলো সামান্যতম দানাপানীর জন্য খাদ্যের বদলে কার্য্যসূচীর মাটি কাটছে কাঠ ফাটা রোদ্দুরেও, সে শুধু জীবনকে ভালবেসে। সঙ্গে রহিম চাচার ছোট বশ রামসুন্দর, বাহন অফিসের পুরানো আমলের রাজদূত গাড়ীটা। মুখ যেন পুড়ে যাচ্ছে রহিম চাচার—রামসুন্দর, একটু বটের ছায়ায় বসলে হয় না?

রামসুন্দরও হয়তো তাই চাইছিল—চলুন তবে।

গাড়ীটাও যেন "বাঁচা গেল" বলে থামিয়ে দিয়েছে তার একটানা গোঁগানি। তিনজনেই জিরিয়ে নেওয়ার আরামে নিরব। প্রথম শব্দ ভাঙলেন রহিম চাচা এবং হঠাৎই কিছুটা অপ্রত্যাশীভাবে রামসুন্দরের অন্তত তাই মনে হয়েছিল—রামসুন্দর! আর সরমাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এবার শুভ কাজটা সেরে ফেললেই তো পার। তোমার বয়স বাড়ছে, বাড়ছে সরমারও।

জানি বাবু কিন্তু বোনটা যে ভেসে যাবে।

কেন? তুমি যেমন ছিলে, যে ভাবে সাহায্য করছিলে তাই বহাল রাখবে।

সরমা কি মেনে নেবে! তাছাড়া আপনাদের সাথে কাজের মধ্যে জীবনটাতো বেশ চলে যাচ্ছে।

না রামসুন্দর এভাবে চলে না এবার তুমি বিয়ে করে ফেল।

বোনটার একটা ব্যবস্থা হলে অবশ্যই করব।

কেন? সরমা কি তেমন কিছু বলেছে।

না, তা অবশ্য বলে নি, তবে ভাটিখানার ব্যাপারে বলে মাঝে মধ্যেই।

যদি সে বিয়ের কথা বলে বলবেন—যেন আর একটু অপেক্ষা করে।

রামসুন্দর যেন কিছু একটা ভাবতে থাকে, মাঝে মাঝে তাকায় রহিম চাচার চোখের দিকে, সে তাকানোতে যেন আকুতি ভরা।

কি হল রামসুন্দর, তুমি কি ভাবছ?

না তেমন কিছু নয়, তবে যদি প্রবোধ দেন একটা অনুরোধ আপনাকে করব।

রহিম চাচার মুখে এক চিলতে হাসি, সেই হাসি ছড়িয়েই জিজ্ঞাসা করেন—কি এমন কথা যে রামসুন্দরের ব্যবহারে এতখানি বিনয়।

আবার যেন ভাবনার মধ্যে ডুবে যায় রামসুন্দর। হয়তো চেষ্টা করে তার বক্তব্যকে

একটু সাজিয়ে নেওয়ার, রহিম চাচা সবকিছু লক্ষ করে বলেন—কি হল কি বলবে বলছিলে বললে নাতো?

বাবু জানেনই তো বোনটার জমি জায়গা নেই। ঠিক মত খেতে পায় না, ইচ্ছে থাকলেও ছেলে দুটোকে পড়তে পারছে না। যদি তার একটু রোজগারের সুরাহা করে দেন, সে তো বাঁচবেই, আমিও যেন মুক্তি পাই। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে রহিম চাচার বুক থেকে, সে বুঝতে পারে রামসুন্দর তিনটে জীবনের দায়ীত্ব কাঁধে নিয়েছে। সেখান থেকে চাইছে বেরিয়ে আসতে। বলেন—আমার হাতে তেমন পথ তো খোলা নেই।

আপনি আপনার রামসুন্দরের জন্য যখন এতখানি করেছিলেন, তখন চেষ্টা করলেই পারবেন।

বেশ চেষ্টা করব, কিন্তু কথা দিতে পারব না। হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে রহিম চাচা রামসুন্দরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন আচ্ছা রামসুন্দর তুমি বলেছিলে রমেশকে খুন হতে হয়েছে, তুমি কি জান তারা কারা?

না বাবু, আমি জানি না।

অথচ তুমি বলেছিলে, সেদিন তুমি রমেশের সাথে ছিলে।

রামসুন্দরের বুকের মধ্যে যেন তুফান উঠেছে, সে তুফান আতঙ্কের, সে তুফান কৃতকর্মের, কিন্তু বলবে কি করে, সে কথা তো বলা যায় না, সেই জন্যই তো প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে আজও।

রহিমচাচা আবার জিজ্ঞাসা করেন তুমি সঙ্গে ছিলে অথচ জানতে পারলে না, তারা কারা?

কিছুটা হালকা হওয়ার চেষ্টা করে রামসুন্দর, তারপর বলে আমি আগে তাদের কোনদিন দেখিনি।

আবার একপ্রস্থ নিরবতা, বটের পাতায় তখন পশ্চিম দিকে ভেসে আসা বাতাস লেগেছে। পাতাগুলো দুলছে এদিক ওদিক ঠিক মানুষে নও অর্থক হাতের চেটো দোলানোর মত। রামসুন্দরের চোখ সেই পাতাগুলোর দিকে, তার মনে হচ্ছে পাতাগুলো যেন তাকে বলছে "রামসুন্দর তুই বলিস্ না, বললে রহিম চাচার মন ভেঙে যাবে, বিশ্বাস হারিয়ে যাবে। যারা আজও তদন্ত করছে আসল অপরাধীকে ধরার জন্য, কিন্তু কিনারা করতে পারে নি তারা ধরে ফেলবে অপরাধীকে।

রহিম চাচার ঠোঁট দুটো আবার কেঁপে ওঠে—তোমরা সেদিন কোথায় গিয়েছিলে?

রামসুন্দরের চোখের চাহনিতে আবার ভয়। তার মনে পড়ে সবকিছু, সে তো জানে সবকিছু, সেই এটাচিটা যে আজও ঘরের উত্তর পূর্ব কোণে মাটির তলায় পলিথিনের থলেতে ভরে চাপা আছে। সে একটু ভেবে নেয়—কি বলবে, তারপর তাকায় রহিম চাচার দিকে

শুনুন তাহলে, সেদিন ছিল অমাবশ্যা, বেরিয়েছিলাম শালা ভগ্নীপোতে রহমৎপুরে নিমন্ত্রণ খেতে। ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল অনেক, পিছন থেকে কারা যেন এসে রমেশকে ধরল জাপটে। আমাকে টেনে নিয়ে গেল বাঁশ বাগানের আড়ালে। আমি তখন ভাবছি এই যাত্রা থেকে উদ্ধার হওয়ার কোন পথ নেই, তারপর শুনতে পেলাম একটা যন্ত্রণাময় চিৎকার, তখন সামনের রাস্তা দিয়ে একটার পর একটা লরি যাচ্ছে খুব দ্রুতগতিতে। সেই চিৎকারটা থেমে গেল, শুনতে পেলাম, রাস্তার বুকে থেকে ভেসে আসা একটা শব্দ। লরিগুলোর যে কোন একটা হবে বোধহয় কাউকে চেপে দিলে যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমনি।

তোমাকে কিছু করেনি?

কয়েকটা লাঠির আঘাতে ধরাশায়ী করে দিয়েছিল আমাকে। তারপর তারা চলে গেল।

তারপর?

ওরা চলে যাওয়ার পর আমি রমেশের খোঁজ করতে লাগলাম, গভীর অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, খুঁজতে খুঁজতে কখন রাস্তার ধারে এসে পড়েছি, তখনও লরি যাচ্ছে রাস্তায়, কিন্তু মাঝরাস্তা দিয়ে নয়, সেই আলোয় দেখি কে যেন থেঁতলানো হয়ে পড়ে আছে রাস্তার উপরে। কাছে গিয়ে দেখি রমেশ।

ইস্।

কি করব ভেবে উঠতে পারিনি, হাত দেখাই লরিগুলোকে, সবাই চলে যাচ্ছে না দাঁড়িয়ে, তারপর কখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি জানিনা। যখন জ্ঞান ফিরল, তখন দেখি জমায়েত হয়েছে অনেক মানুষ, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে রমেশের থেঁৎলানো শরীরটাকে ঘিরে। আর একজন পুলিশ সযত্নে রুমাল দিয়ে তুলছে একটা রক্তমাখা ছুরি।

তারপর?

কয়েকটা মাস কাটার পর যখন বুঝতে পারলাম বোনের খাদ্যে টান পড়েছে। তখন চলে গেলাম সেই কোলাঘাটে নরনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে।

ঐ সময় পুলিশ তোমাকে অনেক খোঁজ করেছিল।

কেন বাবু?

কয়েক জনকে সন্দেহ করে ধরে নিয়ে গেছল থানায়, তাদের সনাক্ত করতে পার কিনা জানার জন্য।

রহিম চাচা আর কথা বাড়ান নি। বলেছিলেন আর কেন এবার চলো ওখানে সব কি হচ্ছে কে জানে।

মোটর বাইকটা এক ঝটকায় গর্জ্জে উঠল ভট্ ভট্ করে, যেটুকু বাতাস বইছিল থেমে গেল, রহিম চাচার পিছনে উঠে বসল রামসুন্দর—তারা যাবে খাল পারে "খাদ্যের বিনিময়ে কর্মসূচী"র আওতায় যেখানে মাটি কাটা চলছে।

রিম্পা চাকরী পেয়েছে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের রাঁধুণীর। কথা রেখেছেন রহিম চাচা, মাসে যা পায়, তার সাথে কিছু চাল ডাল এবং তিনটে পেটের জন্য রান্না করা খাবার। রহিম চাচা রিম্পার ভবিষ্যতের কথা ভেবে সমবায় সমিতিতে একটা পাশ বই খুলে দিয়েছেন। নিজের মেয়ের মত ভেবে যখন তখন চলে যান রিম্পার বাড়ী, শুনেন তার জীবনের উপখ্যান, রমেশের রোজনামচার খরচ। জানতে পারেন রমেশের রোজগারের ঠিকানা, তার থেকেই বুঝতে পারেন তার মৃত্যুর কারণ।

রামসুন্দর কিছুটা হলেও প্রায়শ্চিত্ত করেছে তার কৃত পাপের। সে এখন মাঝে মাঝে চলে যায় কোলাঘাট যেখানে কেটেছে জীবনের অনেকটা সময়, রূপনারায়ণের ভরা কোটাল, মরা কোটাল দেখে দেখে।

রূপনারায়ণের জীবনের মতই জীবনটা কাটছে রামসুন্দর কোটালের। কখনও নদীর স্বপ্ন দেখে তার বুক ভরে যাচ্ছে জলে, ভাসছে বৈঠা হাতে মাঝির নাও। নৌকার পাটাতনে রয়েছে ইলিশ ধরার জাল, রূপোলী ইলিশ গেঁথে যাচ্ছে নদীর বুকে মিলে দেওয়া জালে, নদী যেন হাসছে তার ছলাৎ ছলাৎ ভরা যৌবন নিয়ে। তারপর জল কমছে কমছে। নদীর চড়ায় পড়ছে রোদ্দুর, নদীর বুকে দুঃখ, যৌবন চলে গেল বলে। আবার স্বপ্ন, আবার দুঃস্বপ্ন এইভাবে।

নদী টানছে রামসুন্দরকে। টেনেছিল সেই ছোটবেলায়, টেনেছিল চরম অপরাধ করার পরেও।

দু একদিন থেকে ফিরে এসেছে রামসুন্দর, পঞ্চায়েত অফিসের চাকরী, অনুপস্থিত থাকলে রহিম চাচার চোখে অন্ধকার। সেদিন রবিবার, সন্ধ্যা নেমেছে, অন্যান্য দিনের মতই। তায় অমাবস্যা। পাড়ার বৌগুলো সন্ধ্যে দেখিয়ে যে যার ঘর ঢুকেছে। রামসুন্দরের মায়ের পেটের যন্ত্রণা বেড়েই চলেছে। শুরু হয়েছিল সেই সকালে। যন্ত্রণার চোটে সে ডেকে চলেছে—রাম ও রাম এদিকে একবার আয়না বাবা।

খুব যন্ত্রণা হচ্ছে মা?

হ্যাঁরে, সেই ছোট বড়িটা দেনা বাবা, ঘুমটা যদি আসে।

দিই মা।

রামসুন্দর জানে মা আর বাঁচবে না, ডাক্তাররা অন্তত তাই বলেছেন। ডাক্তাররা বলেছেন— তোমার মায়ের জরায়ু ক্যান্সার হয়েছে।

রামসুন্দরের চোখে মুখে কেমন যেন আতঙ্ক, তার মা দেখেছে তার রাম দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে তার থেকে আন্দাজ করেছে নিজের ভবিষ্যৎ। তবুও তার বাঁচার বাসনা যেন তাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। সে যখন তখন বলে—এবার বৌটাকে আননা রাম, আমি দেখে তবে মরব, আয়না রাম আমার কাছে, এই খানটায় একটু বোস না।

কি বলছ মা।

হ্যাঁরে মরার আগে সরমাকে কি আনবিনা?

আনব মা। কয়েক দিনের মধ্যেই আনব, রহিম চাচা বলেছে।

রিম্পাকে কাল একবার আসতে বলবিতো, ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।

সে তো পরশু গেছে। আমি কোলাঘাট থেকে ফিরে আসার পর। রমেশকে খুব মনে পড়ছে রে রাম। কে যে এমন সর্বনাশ করল।

আবার সেই রমেশ, যাকে ভুলতে চায় রামসুন্দর যে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে আজও, যে পাপবোধ মুহূর্তের লোভজনিত উত্তেজনায় তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তার নামটা কেন যে করছে, সে তো চলে গেছে অনেকদিন আগে। রামসুন্দরের বুকে যেন কে হাপর টানছে খুব দ্রুতগতিতে, মা তো জানে না কে এই সর্বনাশ করেছে, জানলে বুঝতে পারত অর্থ মানুষকে হিংস্র হায়নার থেকেও আরও হিংস্র করে দেয়।

রামসুন্দর বার বার তাকায় যে ঘরে তার মা মৃত্যুশয্যায় সেই ঘরের উত্তর পূর্ব কোনে, যেখানে লুকানো আছে তার লোভের ফসল, সেদিন রামসুন্দর তো ভেবেছিল একদিন এটাচি ভর্তি টাকা নিয়ে সে বাড়ী করবে, সুখে থাকবে, দারিদ্রের হাত থেকে বাঁচবে। বিনিময়ে তো একটা প্রাণ। এমন অনেক ঘটনাই ঘটে। পরের দিন রিম্পাকে দেখে সে স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে। কি সুন্দর লাগতো রিম্পাকে—একমাথা সিন্দুর, হাতে সাদা শাঁখা, পায়ে আলতা, সিন্দুর মুছে দিয়েছে তার দাদা, শাঁখা ভেঙে দিয়েছে তার দাদা, সাদা সাদা পায়ের পাতা হয়েছে তার দাদার জন্য। কি লাভ হল, কেন সেদিন মদ খেয়ে এমন ঘটনা ঘটাল? নিজেই প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিতে পারে না রামসুন্দর।

সন্তানের নিরবতা দেখে মা জিজ্ঞাসা করে—কিরে, কি ভাবছিস্ রমেশের কথা নিশ্চয়, তোর খুব কষ্ট হচ্ছে তাই নারে। থাক তবে যে মানুষটা চলে গেছে তার কথা আর তুলবনা। রাম আমাকে ঘুমের ওষুধটা দেত বাবা, ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে, সহ্য করতে পারছি না।

রামসুন্দর দেখছে তার মাকে, যন্ত্রণাক্লিষ্ট, মৃত্যুপথযাত্রী, মায়ের কাছে সত্যিটা বলতে পারছে না বলে বুকটা ফেটে যাচ্ছে তার।

মা আবার বলে—রাম ওষুধটা দেনা বাবা।

সম্বিত ফিরে রামসুন্দরের—এই যে নাও।

ওষুধটা খেয়ে রামের হাতটা টেনে নিয়ে মা জিজ্ঞাসা করে হ্যাঁরে রাম, আজ যে তুই একবারও বেরুলিনা, ঘরেই কাটিয়ে দিলি সারাদিন।

বেরুবো।

কখন আর যাবি, রাত্রিতো অনেক হয়ে গেল।

হাত ঘড়িটা খাপ থেকে বের করে কুপির সামনে ধরে রাম দেখল সেই ঘড়িটা, যে

ঘড়িটা রহিম চাচা তাকে উপহার দিয়েছিল। তারপর বলেছিল—এই তো সবে আটটা বাজছে মা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলেছিল—ও, যা তাহলে একটু ঘুরে আয়, ঘরে বসে থেকে থেকে তোরও শরীর, মন দুই খারাপ হয়ে যাবে। আর শোন পারিস তো রাণী বৌমাকে একটু ডেকে দিয়ে যাবি।

কেন মা?

ওর সাথে দুটো কথা বলব, মেয়েটা বড় সরল রে।

আচ্ছা। আমি যাচ্ছি মা।

যাচ্ছি বলতে নেই, বল আসছি।

আসছি।

তখন রাত্রি বারটা। রামসুন্দর ফিরে এসেছে বাড়ীতে। তার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে, পা টলছে। সে সরমাকে কথা দিয়েছিল কোনদিন মদ খাবে না, সরমাও কথা দিয়েছিল "দাদা যতই অত্যাচার করুক অন্য কোন পুরুষকে আর আসতে দেব না"। আজ সরমার কথা রাখতে পারে নি রামসুন্দর। সে তো ভুলেই গেছল সেই রাত্রের ঘটনা, মা আবার উস্‌কিয়ে দিয়েছে পুরানো ক্ষতটাকে। সেই যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য অনেক দিন পরে আকণ্ঠ মদ খেয়েছে রামসুন্দর, কিন্তু ভুলতে তো পারছে না। আরও স্পষ্ট ভাসছে সেই রাত্রের ছবি। দ্রুত পায়ে ঢুকে পড়েছে মায়ে ঘরে, তখন মা ঘুমোচ্ছে। ঘরের ভিতরের উত্তর পূর্ব কোণে এসে দাঁড়িয়েছে রামসুন্দর, সে যেন দেখতে পায় রমেশের হাতে সেই এ্যাটাচি, সমস্ত শরীর থেকে ঝরছে লাল টক্‌টকে রক্ত। রমেশ মরে পড়ে আছে, তবুও ছাড়েনি এ্যাটাচিটাকে। দৌড়ে বেরিয়ে আসে রামসুন্দর সাপলা ভরা ডোবার ধারে, সেখানেও সে যেন শুনতে পায়—রমেশের শেষ বারের মত মৃত্যু যন্ত্রণার চিৎকার। রামসুন্দর চিৎকার করে ওঠে—না, না, না এ আমি চাইনি, এ আমি চাইনি। সেই চিৎকার কোথায় ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে আসে রামসুন্দরের কানে। শুনশান রাত্রি, শুনশান গোটা কোটাল পাড়া, কেউ শুনতেও পায় নি, কেউ জানতেও পারেনি। যেমন পুলিশ আজও কিনারা করতে পারেনি রমেশকে কে খুন করেছে, খুনের উদ্দেশ্য কি?

সমস্ত শরীর ঘেমে গেছে রামসুন্দরের। নেশাটাও কেটেছে আস্তে আস্তে। এক পেট জল খেয়ে শুয়ে পড়েছে সে। কেবল শুয়ে আছে ঘুম আসে নি তার চোখের পাতায়।

কিভাবে কে জানে পরের দিন সকালে গোটা পাড়া জেনে গেছে রামসুন্দর গত রাত্রে মদ খেয়ে এসেছিল, জেনে গেছে সমস্ত রাত্রি সে ঘুমোয়নি। কেউ কেউ অবাক হয়ে তাকে দেখেছে। পাড়ার রাণী বৌদি মজা করে বলেছে—বলছিলাম না ঠাকুরপো, বে-থা কর, তাহলে মদও খেতে হবে না, রাত্রি জেগে পড়েও থাকতে হবে না। বিয়ে তো করলেই না,

বললাম তোমার দাদা নেই আমার ঘরটা মাসের পর মাস ফাঁকা রয়ে যাচ্ছে, এ ঘরে এলে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দেব। তাও শুনলে না, এবার রাত জেগে মর, আর খ্যাপা ষাঁড়ের মত চিৎকার কর।

এর আগেও রাণী বৌদি উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছে, এখনও করছে, কিন্তু কোন হ্যাঁ বাচক ঈঙ্গিত রামসুন্দর দেয়নি।

পরের দিন অফিস এসে দেখেছে সবার মুখগুলো, শুনেছে সবাই। জেনে গেছে গত রাত্রির ঘটনা। হিরুবাবু—রমেশকে দেখে, রহিমচাচার সামনেই বলেছে—এবার রহিম চাচা ডাহা ফেল?

রহিম চাচা ডাক দিয়েছেন রামসুন্দরকে, ভয়ে না কি লজ্জায় রহিম চাচার ঘরে এসে অপরাধীর মত দাঁড়িয়েছে রামসুন্দর।

আমাকে ডেকেছেন বাবু।

তুমি শুনতে পাচ্ছো ওরা সব কি বলছে।

ভুল হয়ে গেছে বাবু, আর কোনদিন হবে না।

তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে ....

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছল, তাই ....

আজই শেষ বার, এরপর কিন্তু তোমার চাকরী থাকবে না, কথাটা মনে রেখ।

বাবু!

আর একটা কথা, আগামী সাত দিনের মধ্যে সরমাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুত থেকো।

আপনি যা বলবেন, আপনি আমার মা বাপ।

সেই রাত্রেই সরমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল রামসুন্দর—সরমা আর নয় এবার বিয়েটা সেরে ফেলব ভাবছি।

এতদিনে মনে হল।

আর ভাল লাগছে না, সামনের সপ্তাহেই কালি মন্দিরে কাজটা সেরে নেব।

সরমা অভিমানে বলে—আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারব না।

অবাক হয়ে গেছে রামসুন্দর, এই তো কদিন আগেও সরমা তাড়া দিয়েছিল তাহলে, একথা কেন বলছে সরমা।

তুমি অন্য কাউকে বিয়ে কর।

আমি যে রহিম চাচাকে কথা দিয়েছি।

আমি তো কথা দিই নি।

মজা করছ কেন?

মজা নয়, সত্যিটা বললাম।

তুমি কি বলছো তুমি তা জানো!

না জেনে কিছু তো বলছিনা, আমার পক্ষে তোমাকে বিয়ে করা কোনভাবে সম্ভব নয়।

আমার অপরাধ।

সে তোমাকে বলতে পারব না।

তোমার জন্য আজও আমার শরীরে দাগগুলো রয়ে গেছে।

সে তোমার বোকামির জন্য।

উত্তেজনার পারদ যেন ক্রমশ বাড়তে থাকে রামসুন্দরের—চিৎকার করে বলে "তুমি বলনি তুমি ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে আমার ইচ্ছায় আমি স্থান দেব না। তুমি বলনি—"জানো রামসুন্দর তোমাকে কাছে পাওয়ার পর থেকে কোন পুরুষকে জোর করে দাদা পাঠালে তাদের নানা আছিলায় আমি তাড়িয়ে দিই। তারপরেও যারা ক্ষমতার জোরে আমাকে ভোগ করে সে কেবল আমার শিথিলতায় তাদের ইচ্ছাপূরণ।"

উত্তেজনার পারদ বাড়তে থাকে সরমার সে বলে—হ্যাঁ বলেছিলাম, কিন্তু জানতাম না তোমার জোর নেই, কোন নিজস্বতা নেই, কেবল রহিম চাচার প্রতি নির্ভরশীলতা।

কি বলছ তুমি সরমা।

আমি চেয়েছিলাম তোমার সাথে বেরিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধতে। তুমি বলেছিলে একটা কিছু করে তারপর ঘর বাঁধবো, চাকরী পেলে—বললে বোনের একটা হিল্লে হলে ঘর বাঁধবো, আমি অত্যাচারিত হয়েও সমস্ত মাতাল পুরুষকে এড়িয়ে গেছি শুধু তোমাকে ভালবেসে। বৌদি গলায় দড়ি নিয়ে মারা গেল, ভাটিখানাতে হররোজ পুলিশ হামলা, সংসার চলছে না, তখনও মনে হয়নি শরীরের বিনিময়ে রোজগার করে দাদার বিপদে সাহায্য করি, অথচ তুমি এড়িয়ে চলতে লাগলে দিনের পর দিন।

তাহলে তোমার শেষ কথা এইটাই।

হ্যাঁ। আমি আবার ফিরে গেছি আমার পুরানো জীবনে।

ও তাহলে তুমি পাকাপাকিভাবে বেশ্যা হয়ে গেছ। দোষ কি, তুমিও তো তোমার বোনকে বাঁচানোর জন্য আমার অনুরোধকে বারবার এড়িয়ে গেছ।

আর কিছু বলবে না?

উত্তেজনায় পারদটা দপ্ করে নেমে গেছে সরমার। ধীর স্থির ব্যবসায়ীর মত বলে—যদি সম্ভব হয় যদি ইচ্ছে যায় তাহলে খদ্দের হয়ে আমার ঘরে যেও।

শ্রেষ্ঠ অপমান বুকে নিয়ে ফিরে এসেছে রামসুন্দর, ফিরে এসে দ্যাখে তার ঘরে লোকে লোকে লোকারণ্য। বুঝতে পারে—মা আর নেই। খবর পেয়েছেন রহিম চাচা রামসুন্দরকে স্বান্তনা জানানোর ভাষা তার জানা ছিল না তবুও বলেন—রামসুন্দর এই অসুখ নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তোমার মা দেহ রেখে শান্তি পেয়েছেন। ভেঙে পড়লে চলে, কিছু বলতে পারেনি রামসুন্দর একই দিনে দুটো চরম আঘাৎ তাকে যেন বধির করে দিয়েছে।

রহিম চাচা তার মাথায় হাত রেখে বলেন রামসুন্দর আমি সব শুনেছি, তোমাকে কিছু বলার নেই। তবে এটুকু জেনে রেখ—আল্লা যা করেন সবকিছু মঙ্গলের জন্যই করেন।

রহিম চাচার ব্যবস্থাপনায় শবদাহ শেষ হয়েছে। একদিন শেষ হয়েছে মায়ের আদ্য শ্রাদ্ধ। কয়েকদিন পরে রামসুন্দর যোগ দিয়েছে কাজে। সব হারিয়ে সে যেন ভালবেসেছে কাজটাকে, খুশি রহিম চাচাও। আরও কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন বিকেলে রহিম চাচা রামসুন্দরকে বলে—রামসুন্দর।

বাবু।

এইভাবে কি জীবন চলে নাকি চলতে পারে?

কেন বাবু।

তুমি দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ। আমি বলি কি সরমাকে মন থেকে মুছে একটা মেয়ে দেখে বিয়ে কর।

কি হবে বিয়ে করে?

কেন?

যাকে করব সে যদি ভুল বুঝে ছেড়ে চলে যায়!

কি বলছ তুমি?

সব আনন্দ আনন্দ নয়। সবাইকে হাসিখুশি দেখলেই ভাবা ঠিক নয় যে তারা আনন্দের মধ্যে রয়েছে। তার বুকে দুঃখ যে জমাট পাথর হয়ে বসে আছে কেউ বোঝে না, বোঝার চেষ্টাও করে না।

তুমি যে কি বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার মধ্যে এমন কি দুঃখ লুকিয়ে আছে যা তোমার হাসির আড়ালে, কাজের মধ্য দিয়ে আড়াল করে রেখেছ।

সে সব বলা যাবে না বাবু। যদি কোনদিন তেমন দিন আসে তখন সব বুঝতে পারবেন।

দেখতে দেখতে কেটে গেছে আরও দু তিনটা বৎসর। আবছা হয়ে যাওয়া স্মৃতিগুলো ফিরে আসছে এলোমেলোভাবে। কেন হঠাৎ মাথা গরম হয়েছিল। মনে পড়ছে রমেশের হাতে ছিল সেই অ্যাটাচিটা, যার মধ্যে ভর্ত্তি ছিল সেদিনই ব্যাংক থেকে তুলে আনা পাঁচ লক্ষ টাকা যা রামচন্দপুরের লক্ষীকান্তবাবু তুলে এনেছিলেন ব্যাংক থেকে। রমেশ দেখেছিল টাকা তুলতে। বলেছিল দাদা এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। আজ রাত্রেই কাজ হাসিল করতে হবে। রাত্রের অন্ধকারে দশ মাইল পথ সাইকেল করে রামচন্দ্রপুর গ্রামে গিয়ে বড় রাস্তার ধারে সাইকেল দুটোকে লুকিয়ে রেখে ভীষণ দ্রুততার সঙ্গে পাইপ বেয়ে ছাদে, ছাদ থেকে চিলে কোঠার দরজা খুলে ঘরে, সেখানে রাখা ছিল সেই অ্যাটাচি। তুলে নিয়ে পুনরায় পাইপ বেয়ে নেমে এসেছিল সে। কয়েকটা লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল,

পাছে তারা দেখে ফেলে সেই ভয়ে সাইকেলের কথা না ভেবে, সোজা মেঠো পথ ধরে জঙ্গল পেরিয়ে মূল রাস্তার কাছাকাছি এসে কি যে হল, আর চিন্তা করতে পারছে না রামসুন্দর। সে যেন ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। তার মনে পড়ছে সরমার কথা, যেদিন দুজনে প্রথম মিলিত হয়েছিল। সরমা পাগলের মত চুমু খাচ্ছে রামসুন্দরের মুখে, অনভিজ্ঞ রামসুন্দর। তারপর তার পুরুষাঙ্গ নিয়ে যেন খেলা করছে সরমা, তারপর উত্থান। নতুনত্বের অপূর্ব স্বাদ। তারপর প্রায় প্রতিদিন। সেই সরমা ভুলে যেতে পারল সব কিছু। অস্থির হয়ে উঠছে রামসুন্দর, তার ইচ্ছে হচ্ছে আকণ্ঠ মদ খেতে, নেশা হলে যদি ভুলে থাকা যায়। কিন্তু কোথায় যাবে সে, রাত্রি যে অনেক। আশেপাশে কোন ভাটিখানা নেই, শুকদেবের ছাড়া, সেখানে সরমা আছে যেতে মন চায় না ভালবাসার মানুষের বেলেল্লাপনা দেখতে। তাছাড়া শ্রীহীন হয়ে গেছে শুকদেবের সবকিছু।

অথচ গেছল রামসুন্দর। শুকদেব রামসুন্দরকে দেখে কিছুটা অবাক। জিজ্ঞাসা করেছিল—কি ব্যাপার, বহুদিন পরে, পথ ভুলে না কি?

পথ ভুলে কেন, দেখতে এলাম তোমরা কেমন আছ।

তা বেশ, এসেছ যখন, শুধুই চলে যাবে নাকি একটু বসবে।

শুধু চলে যাওয়ার জন্য কি কেউ শুকদেবের ভাটিখানায় আসে?

তা অবশ্য ঠিক, তাহলে চাটাই পাতা আছে, ওখানে বস।

কি ব্যাপার, তোমাদের এমন দৈনদশা কেন?

ভাল থাকবে কি করে বল, দু দিন ছাড়া পুলিশ আসে। তাদের দিতে দিতেই তো সব শেষ।

কেন সরমা, তার রোজগার কি কমে গেছে?

সে আর কিছুই দেয় না, ঐ তো দেখনা সে ওখানেই বসে আছে।

বোতল বের করে আনে শুকদেব, তারপর জিজ্ঞাসা করে, এক নম্বরতো?

রামসুন্দরের মনে পড়ে যায় সরমার কথাগুলো—"পারো তো খদ্দের হয়ে এস", সরমাকে দেখতে পায় তার সেই ছোট্ট ঘরের দাওয়াও রাখা দড়ির খাটিয়ায় বসে আছে। যেখানে সে এসেই বসে পড়ত। কখনও কখনও শুকদেবের চোখ এড়িয়ে তার হাতটা তুলে নিত নিজের হাতে, তারপর হাতটাকে রাখত নিজের বুকে, চুমু খেত। সেও সুযোগ বুঝে সরমার নরম বুকে হাত বুলাত মনের সুখে। সরমা হাসতো, গলে যেত, কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যেত দুজনেরই কথা। সরমা বলত—"জানো রাম ইচ্ছে করছে তোমাকে শেষ করে দিই।"

রামসুন্দর বলত—চলোনা অন্য কোথাও চলে যাই।

সরমা বলত—আমি বিধবা, এঁটো হয়ে গেছি তোমার ইচ্ছে যাবে আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে?

রামসুন্দর বলত—আচ্ছা সরমা তোমার ইচ্ছে যায় না, একটা বাচ্চার মা হতে।

হুঁ।

বাচ্চা হলে তুমি তাকে লেখাপড়া শিখাবে?

হুঁ।

বলোনা কবে সবকিছু হবে, আমার আর ভাল লাগছে না।

একটু অপেক্ষা কর।

সেই সরমা খাটিয়াতে সিন্থেটিক কালচে সবুজ শাড়ী পরে বসে আছে, পাশে টাঙানো আছে হ্যারিকেন দেখা যাচ্ছে হাত ভর্ত্তি কাঁচের চুঁড়ি, পায়ে মল, পাশে বসে আছে দশাশাই চেহারার তাগড়াই গোঁফওয়ালা একটা লোক। আসার সময় যাকে দেখেছিল রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা লরী থেকে নামছে।

রামসুন্দরের চোখ দুটোতে কে যেন কিছুটা ঝাল ছিটিয়ে দিয়েছে সেইভাবে জ্বলছে, আর মনেও জ্বলছে আগুন, সে দেখছে সরমার লজ্জাহীনতা, সে কি দেখতে পায় নি রামসুন্দর বসে আছে ভাটিখানায়, নাকি দেখছে না।

রামসুন্দর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সরমার হাতে মদের গ্লাস, খাইয়ে দিচ্ছে লোকটাকে। লোকটা জড়িয়ে ধরে আছে সরমার কোমর।

সহ্য করতে পারছে না রামসুন্দর। ঠিক একই ভাবে, ঐ খাটিয়াতে সরমাকে জড়িয়ে ধরত রামসুন্দর। সরমা মদের গ্লাস নিয়ে খাওয়াত রামসুন্দরকে।

রামসুন্দর পান করছে আকণ্ঠ, কথা বলছে নিজের সাথে উত্তর দিচ্ছে নিজেই। রামসুন্দর তুমি তো ভালবাসতে সরমাকে? সরমার জন্য তোমার পিঠের ক্ষতগুলো আজও চক্ চক্ করছে, কেন তুমি সেদিন অপেক্ষা করতে বলেছিলে? দেখছনা তোমার সামনে প্রতিশোধ নিচ্ছে তোমার সরমা।

মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে রামসুন্দরের, শুয়ে পড়েছে চাটাইয়ের উপর, গা বমি বমি করছে, রামসুন্দর ভাবছে একটু বমি হলে বোধহয় আরাম হত। কখনও মনে হচ্ছে সরমা সেই আগের মত কাছে এসে যদি আদরে ভরিয়ে দিত— ভীষণ ভাল লাগত তার।

শুকদেব আর একটা বোতল নিয়ে এসেছে—রামসুন্দর আর একটু খাবে।

দেবে? তবে দাও।

তুমি বাড়ী যেতে পারবে?

না যাব না, এখানেই রয়ে যাব।

তুমি একেবারে মাতাল হয়ে গেছ রামসুন্দর।

একটা দিন, শুধু একটা দিন এবং আজই শেষ দিন।

টাকাটা দাও।

কত টাকা চাই, শুকদেব বাবু।

দুশ দশ।

কেন?

তুমি খেয়েছ।

ও তাহলে পকেটে আছে নিয়ে নাও।

পকেট থেকে টাকা বের করে নিয়েছে শুকদেব—তাহলে এখানেই থাক, কেমন।

থাকলাম।

চলে গেছে শুকদেব তার ঘরে। খাওয়া শেষ করে বোতলটা মাটিতে আঘাৎ করে ভেঙে ফেলেছে রামসুন্দর।

দোকানের আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে শুকদেব। আকাশে উঠেছে নবমীর চাঁদ, সরমার ঝাঁটিবেড়া মাটি খসে পড়া দরমার ভাঙা দরজার দাওয়ায় হ্যারিকেন জ্বলছে পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে। শুকদেব ছিল, খদ্দের ছিল ঘরে ঢুকতে পারে নি সরমা এবং সেই লোকটি, হাসছে সরমা সেই লোকটি সরমার হাত থেকে মদের গ্লাস নিয়ে সরমাকে খাওয়াচ্ছে গ্লাসের মদ, বলছে—খাও, খাও মেরে জান। সরমা বলছে—না তুমি খাও। সে সব কথপোকথন, হাসি ভেসে আসছে রামসুন্দরের কানে। সেই পুরানো হাসি, সেই এলোমেলো কণ্ঠস্বর—রামসুন্দরের নেশাটা যেন কাটতে শুরু হয়েছে। সে তাকিয়ে দেখে খাটিয়ার উপরে লোকটা সরমাকে ধরে টেনে নিচ্ছে। মুখে গলায় বুকে চুমু খাচ্ছে পাগলের মত। তার দুটো হাত সরমার শরীরকে দলছে, দুমড়াচ্ছে, মুচড়াচ্ছে, আর সরমা লতার মত তার শরীরে যেন পাক খাচ্ছে বার বার।

সরমা মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে রামসুন্দরের দিকে, হয়তো কোন সন্দেহ থেকে, তারপর নিশ্চিন্ত হচ্ছে—রামসুন্দর মদের নেশায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে।

রামসুন্দর স্পষ্ট দেখছে লোকটা সরমাকে যেন বুকে ভরে নিয়ে ঢুকে গেল ঘরের ভিতরে, সরমা কেন কে জানে বেরিয়ে এসে আর একবার দেখে নিল রামসুন্দরকে। বাইরের হ্যারিকেনটা নিয়ে আবার ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে, লাগিয়ে দিল দরমার ভাঙা দরজাটা। যে দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমস্ত ঘরটা।

রামসুন্দর উঠে বসেছে, স্বগতোক্তি করছে—সরমা, তুমি বেইমান, তুমি দেখেও দেখলে না—তোমার রামসুন্দর পড়ে আছে, তুমি জানার চেষ্টাও করলে না—কেন? রক্তে আগুন ধরতে শুরু হয়েছে রামসুন্দরের। সে আগুন জ্বলছে একটু একটু করে। কয়েকটা শৃগাল

ডেকে উঠল দূরে, কয়েকটা কুকুর দৌড়ে গেল ঝাঁটিবেড়ার ঘরের দরজার পাশ দিয়ে, ঐ তো সরমা আবার বেরিয়ে এসেছে, তার পরনে শাড়ীটা নেই।

রামসুন্দরের মনে হল সরমা আর একবার দেখে নিচ্ছে বাইরের অবস্থাটা, এভাবেই মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসত সরমা যখন সে যেত, পাছে কেউ দেখে নেয় এই ভয়ে, আজতো ভয় নেই, তাহলে দেখছে কেন? নাকি এটাই তার অভ্যাস। যেমন অভ্যাস প্রতিদিন নিত্য নতুন পুরুষের সাথে যৌন মিলন করার।

অপূর্ব শীৎ-কারে হাসছে তারা। জ্বলছে রামসুন্দর, ভাঙা দরজা, সবকিছু অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে তার ফাঁক দিয়ে, আর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে রামসুন্দরের। ধীরে ধীরে পৌঁছে গেছে দরজার কাছে। সে এবার দেখছে সবকিছু স্পষ্টভাবে। সরমা খুলে ফেলেছে লোকটার জামা, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। তার লুঙ্গিটাও খুলে ফেলে দিল, তারপর যেমন করত তার বেলায়—লোকটার উত্থিত পুরুষাঙ্গ ধরে খেলা করছে সরমা, লোকটাও খুলে ফেলেছে সরমার সবকিছু।

নগ্ন সরমা—লোকটা জীভ বুলাচ্ছে সরমার গুপ্ত শরীরে। তার হাত দুটো যেন পেষণ করছে সরমার বুক। তারপর সরমার শরীরে শীরর রেখেছে লোকটা। একটা দুরন্ত খ্যাপা ষাঁড় তার সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন খুঁড়ে চলেছে ভিজে থাকা মাটি। কিছুটা সময় পরে যেন লাভা গড়িয়ে পড়ছে আগ্নেয়গিরী থেকে। দুমড়ে মুচড়ে, যাচ্ছে সরমা, কখনও সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরছে লোকটাকে। অদ্ভুত সব শব্দ করছে দুজনে তারপর শান্ত হয়েছে খ্যাপা ষাঁড়টা, শান্ত হয়েছে পৃথিবী, একটা বজ্রঘোষিত ঝড়, জল শেষে সব ভেজা ভেজা।

রামসুন্দরে চোখে তাদের এক একটি রাত্রির ছবি। হুবহু একই ছবি। তার মনে স্বার্থপরতা—কাউকে ভাগ না দেওয়ার। আরও কিছুটা সময় এইভাবে, ঘুমিয়ে পড়েছে লোকটা তার বুকে মাথা রেখে। প্রশান্তিতে ঘুমাচ্ছে সরমা।

দুজনেই নগ্ন।

রামসুন্দরের মনে যেন স্থান নিয়েছে আর একটা ষাঁড় তার মধ্যে ধ্বংসের ক্রোধ। ফিরে এসেছে চাটাইয়ে যেখানে পড়ে রয়েছে কয়েকটা ভাঙা বোতল। তুলে নিয়েছে তার একটা।

তখন জ্যোৎস্নাকে ঢেকে দিয়েছে কালো মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন, বোধ হয় একটা ঝড় উঠবে। ঝড়টা উঠল এক্ষুণি। দেরী করেনি রামসুন্দর। দরজাটা ভেঙে দিয়েছে এক ধাক্কায়, কিছু বোঝবার আগেই ভাঙা বোতলের ধারালো দিকটা কয়েকবার সজোরে আঘাৎ করেছে সরমার পেটে, বুকে। ছটফট্ করছে সরমা কিছুক্ষণ, তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে সে। লোকটা পালিয়ে গেছে প্রাণের ভয়ে, কেবল লুঙ্গিটা সঙ্গে নিয়ে। বন্ধ হয়েছে ঝড়, বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ভেঙে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে তখনও। শান্ত রামসুন্দর, একটু আগের

ঘটনার উত্তেজনা তার মধ্যে নেই। ধীর পদক্ষেপে শুকদেবের ভাটিখানা ছেড়ে এসেছে বড় রাস্তায়, আসার পথে দাঁড়িয়ে থাকা সেই লরিটা আর নেই।

পরের দিন পুলিশ এসেছে, নিয়ে গেছে সরমার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। ভাঙা বোতল, লোকটার জুতো জোড়া, জামা সবকিছু নিয়ে গেছে থানায়।

আগের মতই পঞ্চায়েত অফিসে কাজ করছে রামসুন্দর। গোটা এলাকা জেনে গেছে সরমা খুন হয়েছে। সবাই জেনেছে খুন করেছে সেই লরির ড্রাইভার। থানায় তেমনই স্বাক্ষ দিয়েছে শুকদেব। রামসুন্দরের কথা কোনওভাবেই তুলেনি শুকদেব। সে অন্তত জানে রামসুন্দর আকণ্ঠ পান করে ঘুমিয়েছিল সমস্ত রাত্রি। তারপর ঝড়বৃষ্টি শেষে হয়তো চলে গেছল তার বাড়ী। সে তো দেখেছে—সেই লরীর ড্রাইভার সরমাকে নিয়ে কাটিয়েছে সমস্ত রাত্রি। তার ঘরে এখনও সেই ড্রাইভারের কাছ থেকে নেওয়া দশ হাজার টাকা রাখা আছে কাঠের বাক্সে, আর তার আঙ্গুলের সোনার আংটি। কিন্তু বলতে পারেনি পুলিশকে।

রামসুন্দর পঞ্চায়েত অফিসে কাজ করছে মন দিয়েই, তবু কেমন যেন অন্যমনস্কতা মাঝে মাঝে তাকে ভর করছে। লক্ষ করেছেন রহিম চাচা। তিনি রামসুন্দরের কাছে গিয়ে বলেন—রামসুন্দর।

ফ্যাকাসে রামসুন্দর বলে—কিছু বলবেন বাবু।

জানি তুমি সরমার মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছ, তুমি তো তাকে ভালবাসতে, ভালবাসার মানুষ হারিয়ে গেলে সবাই ভেঙে পড়ে।

না বাবু তেমন কিছু হয়নি।

আমি সবই বুঝি রামসুন্দর। তুমি কয়েকদিন বোনের বাড়ীতে ভাগনেদের নিয়ে মনটা ঠিক করে এস।

না বাবু, আমি কোথাও যাব না, যদি যেতে হয় একবারেই চলে যাব।

হতাশ রামসুন্দরকে দেখে আর কথা বাড়াননি রহিম চাচা।

কেবল বলেছিলেন—বেশ তোমাকে আর কোথাও যেতে বলবনা। তোমার যা ইচ্ছে যায় তাই কর।

পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই লরির ড্রাইভারকে। রামসুন্দর অন্তত ভেবেছিল পশ্চিমবাংলার পুলিশের ক্ষমতা নেই খুনিকে ধরার থাকলেও রাজনৈতিক চাপে ধরেনা অপরাধীকে। যদিও সেই ড্রাইভারকে ধরে ফেলে ভয়ে টাকার জোরে মুখ বন্ধ করে দেবে পুলিশের, কেননা তার জুতো, জামা পড়েছিল সরমার ঘরে। স্বাভাবিক নিয়মেই ধামা চাপা দেবে পুলিশ। তাছাড়া প্রায় সাত বৎসরের বেশী সময় কেটে গেল অথচ ধরতে পারল না রমেশের খুনিকে। কি কারনে?

ময়না তদন্তের রিপোর্ট এসেছে। সরমার ফুসফুস এবং হৃদযন্ত্রে আঘাৎ পাওয়া গেছে।

খাদ্যনালী আঘাতে বহু ছিদ্র হয়ে গেছে। বোতলে আঙ্গুলের ছাপ পরীক্ষা করেছেন Finger Print Expart. তার রিপোর্টে যে খুন করেছে তার হাতের তালুতে রয়েছে একটা কাটা দাগ।

পুলিশ গত দশ বৎসরের সমস্ত Finger Print রিপোর্ট নিয়ে খুঁজছে ঐ ধরণের আর একটা অথবা তারও বেশী সেই হাত। যে হাত খুন করেছে সরমাকে।

তদন্তের অগ্রগতি দেখে ঘুমতে পারছে না রামসুন্দর।

অফিসে আসলেই রহিম চাচা বলেন—রামসুন্দর তোমার শরীরটা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। জানি তুমি ভুলতে পারবে না, তবুও তোমাকে বলছি তুমি এবার একটা বিয়ে কর, তাকে দেখে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা কর সরমাকে।

রামসুন্দর উত্তর দেয়—আর বিয়ে করে কি হবে, যাওয়ার সময় তো ঘনিয়ে এল।

সে কি রামসুন্দর, এই বয়সে এখনও আমি বহাল তবিয়তে দিন কাটাচ্ছি, আর তুমি বলছ যাওয়ার সময় হয়ে গেল।

না বাবু আমি বুঝতে পারছি—এবার আমাকে যেতে হবে।

মদ খেতেও ভয় পাচ্ছে রামসুন্দর, মদ সবকিছুই পারে মদ বিশ্বাসঘাতকতা করেনা। অথচ তাকে যেন টানছে।

দু তিন মাস কেটে গেছে। মানুষ ভুলতে শুরু করেছে সরমাকে।

পুলিশ হঠাৎ যেন নিস্ক্রীয় হয়ে গেছে। শুকদেব, আশা ছেড়ে দিয়েছে সত্য জানার।

রিম্পা এসেছে অনেক দিন পরে তার দাদার বাড়ী, বাড়ীটা যেন শ্রীহীন। ঝাঁট পড়েনি কতদিন। ঝাঁট দিয়েছে, বহুদিন পরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলেছে রামসুন্দরের বাড়ীতে। রান্না করেছে রিম্পা যত্ন করে। তারপর রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া শেষে গল্পে বসেছে দাদার সাথে, অনেক দিনের জমে থাকা কথা নিয়ে—দেখ দাদা এ খুনটারও কিনারা হল না, যেমন তোমার জামাইয়ের হয় নি। কি জানো এখানের পুলিশগুলোর একটা অংশ নিজেরাই অপরাধ আড়াল করছে কিছু টাকার বিনিময়ে।

রামসুন্দর দেখছে রিম্পাকে তার চোখে মুখে হতাশার ছাপ, কেবল বলে হুঁ, তাইতো দেখছি।

রিম্পা তার দাদাকে ভাল করে দ্যাখে তারপর বলে, ধরেই বা কি হবে, যারা গেল তারা তো আর ফিরে আসবে না। তাছাড়া খুনি যদি কোন বিশেষ দলের হয় তাহলে তো তার কোন শাস্তিই হবে না।

রামসুন্দর অন্যমনস্কভাবে বলে ঠিকই তো।

আচ্ছা দাদা, এমনও তো হতে পারে যে বা যারা খুন করেছে, তারা আশে পাশের কেউ। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আঁতকে ওঠে রামসুন্দর, তারপর স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় বলে এমন তো হচ্ছেই।

তুমি শোননি অপরাধী পুলিশের নাকের ডগায় অমুক দলের ছত্রছায়ায় বহাল তবিয়তে আছে। পুলিশ তার কেশাগ্র স্পর্শ করারও সাহস দেখায়নি!

রিম্পা, আর একবার দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না দাদা, একটা কথা বলব রাখবে?

বল না।

তুমি আমাদের পাড়ায় চম্পাকে বিয়ে করবে?

কে চম্পা?

যে তোমার সাথে খুব খুনসুটি করত।

না রে আমি আর ওসব ভাবছি না।

অফিসে গিয়ে রামসুন্দর রহিম চাচার কাছে খবর পায়। জান রামসুন্দর—সেই লরির ড্রাইভার ধরা পড়েছে। রামসুন্দরের মুখটা যেন বাদল মেঘের ছায়া—বলে তাই নাকি?

শুধু তাই নয় মারের চোটে সে তোমার নাম বলেছে। যদিও আমরা বিশ্বাস করিনি, তাছাড়া শুকদেবও পুলিশের কাছে বলেছে সে যখন মাঝরাত্রিতে বাইরে প্রকৃতির ডাকে বেরিয়েছিল, তখন তোমাকে দেখতে পায় নি, সরমা আর ঐ ড্রাইভারটা ঘরের মধ্যে কথা বলছিল।

রামসুন্দরের বুকে কে যেন একটা ভীষণ বড় হাপর বসিয়ে টান মারছে। তবু বলে—প্রমাণ তো করতে হবে।

সে তো বটেই।

কথপোকথনের তখন শেষ পর্যায়—পুলিশ গাড়ী এসে ডাক দেয়—রহিম চাচা আছেন নাকি?

রহিম চাচা রামসুন্দরকে অফিসের মধ্যে থাকতে বলে পুলিশের গাড়ীর কাছে এসে বলেন—কি ব্যাপার?

আপনাকে একটু বিরক্ত করতে আসলাম, কিন্তু ডি. এস. পি. অপরাধ দমন শাখার নির্দেশ তো মানতে হবে।

সে তো বটেই, কিন্তু কি ব্যাপারে বললেন না তো? আমরা রামসুন্দরকে একবার থানায় নিয়ে যেতে চাই।

কেন?

পরে জানতে পারবেন।

শুনতে পেয়েছে রামসুন্দর, পালিয়ে যেতে পারত অনায়াসে, কিন্তু তা সে চায়নি, বেরিয়ে এসেছে অফিস্ থেকে—চলুন আমি যাব।

থানায় জিজ্ঞাসাবাদ থেকে আরম্ভ করে আঙ্গুল, এবং হাতের ছাপ নিয়ে অফিসে ছেড়ে দিয়ে গেছে রামসুন্দরকে। কেননা সে রহিম চাচার প্রিয় মানুষ। অযথা হয়রানি করলে রহিম চাচা রুষ্ট হবেন। তাহলে এক কলমের খোঁচায় কোথায় যে যেতে হবে কে জানে।

আরও কিছুদিন পরে আদালতে কেশ উঠেছে। একে একে জেরা করছেন বাদী পক্ষের উকিল। শুকদেবকে প্রথম জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তোলা হয়েছে ড্রাইভারকে সমস্ত ঘটনা সে বলেছে, বলেছে—"আমরা তখন গভীর ঘুমে।"

উকিল জিজ্ঞাসা করে—কিভাবে?

ড্রাইভার বলে—সরমা আমার বুকে।

তোমার জুতো, জামা রয়ে গেল কেন?

ভয়ে স্যার।

তার মানে?

বলছি স্যার—তখন আমরা গভীর ঘুমে, হঠাৎ দরজা ভেঙে (রামসুন্দরের দিকে আঙ্গুল তুলে) ঐ লোকটা এসেই সরমার বুকে, পেটে, ভাঙা বোতলের অংশ দিয়ে আঘাত শুরু করল।

কতবার?

অত দেখিনি স্যার, কেবল দেখলাম রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

তারপর তুমি পালিয়ে গেলে, তাইতো?

হ্যাঁ স্যার।

কোথায়?

রাস্তায়, যেখানে গাড়ী ছিল, সেখান থেকে সোজা ভুবনেশ্বর।

তারপর উকিল বলেন—মহামাণ্য বিচারক মহাশয়—এবার আমি রামসুন্দর কোটালকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই।

বিচারক বললেন—আবেদন মঞ্জুর।

রামসুন্দর কাঠ গড়ায় উঠে পাঠ করছে শপথ বাক্য। আদালতের গ্যালারী, চেয়ার সব ভর্তি। বাইরেও থিক্ থিক্ ভীড়। রিম্পার মুখে নির্ভয়তার ছাপ, সে জানে তার দাদা নির্দোষ এবং একটু পরে সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে। রামসুন্দরের ভাগ্নে দ্বয় বসে আছে রিম্পার দুপাশে। রহিম চাচা যেন বিশ্বাস করতে চাইছেন না। এমনই মনের ভাব।

কাঠগড়ায় রামসুন্দর, বাদী পক্ষের উকিল তার সামনে তুমি রামসুন্দর কোটাল।

হুঁজুর, আমি রামসুন্দর কোটাল।

তুমি ওকে চেন?

আঙ্গুল তুলে ড্রাইভারকে দেখান উকিল।

রামসুন্দর নিরুত্তর।

দেখতো এই বোতলটা চিনতে পারছ কিনা?

রামসুন্দর নিরব।

সরমাকে ভালবাসতে, কিন্তু তোমার ভালবাসার বাসায় ড্রাইভার ভাগ বসানো এবং ড্রাইভারকে স্বেচ্ছায় ভাগ দেওয়ার জন্যই কি তুমি সরমাকে খুন করলে?

উত্তর নেই রামসুন্দরের কাছ থেকে।

রিম্পার হাসি মুখ বদলাচ্ছে, তার মুখ থমথমে, রহিম চাচা তার সাদা হয়ে যাওয়া চাপ দাঁড়িটায় হাত বুলাচ্ছেন বার বার।

আবার গর্জে ওঠেন উকিল—এই ছুরিটা তুমি চেন।

মুখ তুলে রামসুন্দর, তার চোখ রিম্পার চোখের দিকে, তার মনে যেন প্রচন্ড ভয়—সরমাকে খুনের জন্য নয়, ভয় রিম্পার কাছে ধরা পড়ে যাবে বলে।

উত্তর দাও।

মাথাটা নিচু করে রামসুন্দর।

পাঁচ লক্ষ টাকা ভর্তি এ্যাটাচিটা কোথায় রেখেছো।

আবার তাকায় রামসুন্দর, এবার তার দুটো ভাগ্নের দিকে, একবার রহিম চাচার দিকে।

উকিল---বিচারকের দিকে তাকিয়ে বলেন মহামান্য বিচারক—এই ছুরি এবং এই বোতল যে আঙ্গুল এবং হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে দুটো ছাপেরই হাতের তালুতে একটা কাটা দাগ।

কাঠ গড়ায় রাখা রামসুন্দরের হাতটা তুলে ধরে বলেন—এই দেখুন বৃদ্ধাঙ্গুষ্টের নিচে সেই কাটা দাগ।

একটু আগে গুঞ্জন চলছিল আদালতের ভিতরে। এখন সবাই নিরব। বিচারক মহাশয় Finger Print Expart এর Report দেখছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তারপর সেটা রেখে দিলেন। রামসুন্দরের দিকে তাকালেন মহামান্য বিচারক। বললেন—রামসুন্দর তুমি কি কিছু বলবে?

গুঞ্জন শুরু হল আদালতের ভিতরে, ঘামছেন রহিম চাচা, রিম্পার চোখে জল, সে জল শুকিয়ে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন।

মহামান্য বিচারক উপস্থিত সবাইকে চুপ করতে বলে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—রামসুন্দর তুমি আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলবে?

রামসুন্দর তাকায় রহিম চাচার দিকে, যিনি তাকে বহুবার বিভিন্ন কেশে সঙ্গে করে নিয়ে গেছলেন আদালতে। যাকে কাঠগড়ায় উঠে বলতে শুনেছিল—"মহামান্য আদলত আমি বলছি আমি নির্দোষ" কখনও বলেছিলেন—"মহামান্য বিচারক—আমি স্বচক্ষে

দেখেছি", কখনও বলেছিলেন—"মহামান্য বিচারক মহাশয় আমি জানি এটা অন্যায়, কিন্তু বৃহত্তম স্বার্থে বাধ্য হয়েছি। তা যদি অপরাধ হয় তাহলে আমি অপরাধী"।

ধীরে ধীরে মুখ তুলে রামসুন্দর—হাতের তালুতে করে চোখ দুটো মুছে নেয়, তারপর বলে ওঠে—মহামান্য বিচারক মহাশয়—"আমি খুন দুটো করেছিলাম"—

উকিল তার শামলাটাকে দুহাতে ধরে বিচারকের দিকে এক পাক ঘুরে বিজয়ীর হাসেন।

বিচারক মহাশয় আবার জিজ্ঞাসা করেন—"আর কিছু বলবে?"

রামসুন্দরের চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে—সে বলে ওঠে—মহামান্য বিচারক ভালবাসার বেশাতী আমি সহ্য করতে পারিনি, কেউ যেন ভালবাসা নিয়ে বেশাতী না করে। প্রচন্ড লোভ আমাকে বাধ্য করেছিল রিম্পার শিঁথির সিঁদুর মুছে দিতে, কেউ যেন লোভের বশবর্ত্তী হয়ে এমন কিছু না করে যাতে করে কারও শিঁথির সিঁদুর মুছে যায়, কোন সন্তান যেন পিতৃস্নেহ হারা হয়ে না যায়।"

রামসুন্দর মাথাটা আবার নিচু করে নিল, যেমন ছিল।

বিচারক রায় দিলেন—দুটি নৃশংশ খুনের অপরাধে আসামী রামসুন্দর কোটালকে আজীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল।

আদালতের বাইরে শুরু হয়েছে চিৎকার চেঁচামেচি।

আদালতের ভিতরে নিরবতা, রামসুন্দরের চোখ দেওয়ালে টাঙানো নদীর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডারের দিকে যে নদীটাতে জল নেই একবিন্দুও, এক দল গরু পেরিয়ে যাচ্ছে এপার থেকে ওপারে—বোধহয় প্রথম গ্রীষ্মে।

হঠাৎ রিম্পার বড় ছেলেটা বলে ওঠে—হ্যাঁগো মা তুমি তো বলতে মামা ভীষণ ভাল। তাহলে বাবাকে খুন করল কেন?

বিচারকের কানে গেছে কথাটা, কথাটা কানে গেছে রামসুন্দরের তার হাতে তখন হাত কড়া পরাচ্ছে দুটো ষন্ডামার্কা পুলিশ। রিম্পা সেদিকে আর তাকায়নি।

—